[illegible]

ভবঘুরের

গল্পের ঝুলি

(পৃথিবীর নানাদেশের ছেলেমেয়েদের গল্প)

ভূপর্য্যটক
রামনাথ বিশ্বাস

মিত্রালয়—১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দাম—পাঁচসিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

মার্চ্চ—১৯৪৪

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এতে কি কি গল্প আছে ?

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

মরণ বিজয়ী চীন—৩৲
আজকের আমেরিকা—২॥০
আফগানিস্থান—২৲
তরুণ তুর্কী—২৲
কোরিয়া ভ্রমণ—১।০

উৎসর্গ

বইটি দিলাম, ভারতের ভাবী পর্যটকদের হাতে।

লেখক

আমার কথা

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই মা বাপের কাছ থেকে সাধারণতঃ শেখে শুধু হুকুম তামিল করার শিক্ষা, ভাবে কি করে কেরাণী হওয়া যায়! কিন্তু আমাদের দেশের মা বাপের মনের মত মন, সব দেশের মা বাপের নয়। তাই সে সব দেশের ছেলেমেয়েরা ছোট বেলা থেকেই ভাবতে শেখে স্বাধীন মন নিয়ে, এবং ভবিষ্যতে কি করে ভয়ডর দুর্ব্বলতাকে দূরে রেখে স্বাধীন মন নিয়ে কাজের মানুষ হওয়া হওয়া যায় তারও চেষ্টা করে। আমি দেশ বিদেশে ঘুরে চাক্ষুষ দেখে এসেছি সে সব দেশের ছেলেমেয়েকে, মিশেছি তাদের সঙ্গে। চোখে দেখা সেই সব ছেলেমেয়ের ছবি আজও মনের কোণে স্পষ্ট আঁকা রয়েছে, অন্তরে রয়েছে তাদের প্রতিটি কথার প্রতিধ্বনি, আর তাই আমার ভবঘুরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। এ শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ের ভাগ আর কাউকে না দিয়ে, দিতে চাই আমার এদেশের ছোট্ট বন্ধুদের, তারা যে আমার বড় আপন জন, ইচ্ছে করে তাদের জনে জনের কাছে গিয়ে শোনাই গল্প—কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, তাই আমার 'গল্পের ঝুলি'কে বইয়ের রূপ দিয়ে হাজির করলাম তাদের কাছে।

গল্প গল্পই, সাহিত্য আমি বড় বিশেষ বুঝি না, আমি ভবঘুরে পর্য্যটক'—কলমের গতির চেয়ে পায়ের গতিটার চর্চ্চাই বেশী

করে করেছি। এতে দুঃখ নেই কোনও ; যেমন দেখে এসেছি সহজ দৃষ্টিতে এই পৃথিবীকে, তেমনি সহজ করেই বলবার চেষ্টা করেছি সেই সব গল্প। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় সাহায্য পেয়েছি আমার সহজিয়া বন্ধু 'মৌমাছির' কাছ থেকে। এর প্রতিটি লেখায় সে তার মধু মাখিয়ে দিয়েছে। তাই হয়েছে এই লেখাগুলো মিষ্টি।—সেও সাহিত্যিক বলে নিজের পরিচয় দিতে চায় না, এ দেশের ভূয়ো গর্ব্বে মন তার ঘেঁায়াটে নয়, এ দেশে এসে তার মাঝেই পেয়েছি বিদেশী প্রাণের পরশ, তিনি পায়ে হাঁটা ভবঘুরে না না হলেও পুঁথিঘাঁটা ভবঘুরে বটে—তাই আমাদের দুজনের অন্তরের মিল রয়েছে এই বইটির প্রতি লাইনে লাইনে। তাকে এজন্য ধন্যবাদ আমি দেব না, তাকে ধন্যবাদ দেবে আমার দেশের ছেলেমেয়েরা—কারণ তার চেষ্টাতেই এই বই বেরুলো। আমি খুশী হবো, যদি বাঙলার ছেলেমেয়েরা বইটি পড়ে এখন থেকেই স্বাধীন হবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে নিজেদের।

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

শক্ত হলেই ভক্ত মেলে, নইলে সবাই পায়ে ঠেলে

বিদেশের অনেক গল্পই তোমাদের বলেছি। আজ তোমাদের কাছে যে লোকটির গল্প বলব, সে এ দেশের লোক হলেও এখন বিদেশেই বসবাস করে। লোকটি থাকে ক্যালিফোর্ণিয়ার ফ্রিস্কো সহরে—যাকে আমরা বলি 'সান্‌ফ্রান্সিসকো', সেখানেই। লোকটির আসল নাম কি জানি না, তবে বর্ত্তমানে সে হামিদ বলেই সকলের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে। এই হামিদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় সান্‌ফ্রান্সিসকোতেই। তাকে যখন আমার চলার পথের কাহিনী শোনাই,—সে-ও শুনিয়েছিল তার নিজের জীবনের বিচিত্র গল্প। তার-ই কিছুটা আজ তোমাদের শোনাবো, কারণ আমার চলার পথে যে সব বন্ধুদের কাহিনী আমাকে সাহস আর শক্তি যুগিয়েছিল, সেই সব কথাই তোমাদের শোনানো একান্ত দরকার।

হামিদ হলো শ্রীহট্ট জেলার বিশ্বনাথ পরগণার লোক। ছোট-বেলায় সে লেখাপড়া শেখেনি মোটেই। বয়স যখন তার আঠার-উনিশ, তখন সে একখানা ছেঁড়া কাঁথা আর কলকাতা আসার ভাড়াটি সম্বল করেই খিদিরপুরে এসে উপস্থিত হলো,

এবং পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই এক সারেঙ্গ তাকে বয়'এর কাজে বহাল করলে। কাজেই ভাগ্যও খুব ভালো বলতে হবে, 'বয়'এর চাকরী জুটলো বটে, কিন্তু কোন মাইনে ছিল না ; শুধু খাওয়া আর থাকা,—ব্যস ! এই পর্য্যন্ত। তবুও হামিদ ভাবে—'আল্লা বুঝি এবার মুখ তুলে চাইলেন।' তার উপর সারেঙ্গ যখন একদিন হামিদকে ভরসা দিয়ে বললে যে, তাকে সে নিশ্চয়ই যে কোন সারেঙ্গের সঙ্গে আমেরিকা পাঠিয়ে দেবে, তখন তার মনতো একেবারে আনন্দে আর আশায় নেচে উঠল। সারেঙ্গ হামিদকে খুবই ভালবাসত, আদর যত্নও করত, এমনকি ভালো ভালো জামা কাপড়ও সে তাকে কিনে দিয়েছিল ; কিন্তু একদিন কোনও কারণে ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধলো। হামিদ তার দেওয়া পোষাকপরিচ্ছদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ; কিন্তু যাবে কোথায় !—যে দিকে দু-চোখ যায় ? অগত্যা সে ঠিক কর্‌ল যাবে বোম্বাই।

তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে কেউ বোম্বাই যেতে চাইতনা। কিন্তু তার ছিল নূতনের আশা, অদম্য উৎসাহ—আর সবার চাইতে যে সেরা জিনিষ—সেই বুকভরা সাহস। তাই সে হেঁটেই কলকাতা থেকে বোম্বাই রওনা হল। তার বোম্বাই যাওয়ার পথে সে হিন্দুর মত টিকি রেখে, ধুতি প'রে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে, দিনান্তে আধপেটা খেয়ে, আর না খেয়ে বছরখানেক পরে সেখানে গিয়ে হাজির হল। নিঃসহায় হামিদ, বহু কষ্ট করে বোম্বাই-এ গিয়ে পৌঁছাল বটে ; কিন্তু দেখা দিল আর এক

বিপদ। তার সারাগায়ে বেরুল একরকম বিশ্রী ঘা। এজন্যে লোকে তাকে পথে হাঁটতে দেখলে একপাশে সরে দাঁড়াত, ঘেন্নায় নাক কোঁচকাতো। ভারী কষ্ট তার। কেউ ভিক্ষে দেয়না—কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়ও না। দুঃখে কষ্টে তার কান্না পেত। শেষকালে বোম্বাই-এর 'দাদার' অঞ্চলের এক বুড়ো জেলে তাকে ঠাঁই দিলে। তারপর এই জেলেই নানারকম টোট্‌কা টুট্‌কী ওষুধপত্তর দিয়ে তার গায়ের ঘা'গুলোও সারিয়ে দিলে। হামিদ ভেবে পায় না, কি করে এই বুড়ো জেলের ভালবাসা আর যত্নের ঋণ শোধ দেবে। তাই সে বুড়ো জেলেকে একদিন তার সত্যিকারের সব পরিচয় দিয়ে বল্লে, জেলে যদি তাকে মাছের কারবারে বহাল করে তবে সে 'জান্' দিয়ে তার কাজ করবে। জেলে হামিদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে ভারি খুশি হোল। হামিদও মাছের ব্যবসায়ে মন-প্রাণ দিয়ে লেগে পড়লো। কাজের ফাঁকে একটু ছুটি পেলেই বসে বসে ভাবে—সেই আমেরিকা যাওয়ার কথা। সে জেগে জেগেই দেখে আমেরিকার স্বপ্ন। সেই সুখের স্বপ্ন সফল হবে কিনা কে জানে। এদিকে এরই মধ্যে ধীরে ধীরে হামিদের ওপর বুড়ো জেলেরও ভারি মায়া পড়ে গেল। তারপর একদিন তো সে হামিদকে বলেই বসল যে, এক মালাবারী মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে সে হামিদের বিয়ে দিয়ে তাকে বোম্বেতে রেখেই তার ঘর সংসার বেঁধে দিতে চায়।

হামিদ দেখলে—সর্ব্বনাশ! তা হলে সে আমেরিকা যাবে

কি করে! সে ভাবলে, না! ঐ মায়ার বাঁধন একবার যদি জীবনে পড়ে, তবে সেই বাঁধন ছেঁড়া যে শক্ত হবে—নিষ্ফল হবে তার সাধের স্বপ্ন। তাই সে তখন ঐ বুড়ো জেলেকে খুলে বললে সব কথা। 'সে আমেরিকা যাবেই,' এই তো তার মনের ইচ্ছা। এ ছাড়া আর কিছুই তো সে চায় না—ভাবে না সে অন্য কোন কথা। জেলে মহা ভাবনায় পড়লো। ভেবে চিন্তে হামিদকে জিজ্ঞাসা করলে—আমেরিকা এখান থেকে কত দূর বলতে পারিস? হামিদ বল্লে—তা' ত ঠিক বলতে পারি নে, তবে জাহাজীরা বলেছে যে, সে ছ'মাসের রাস্তা। কথাবার্ত্তার আর আলোচনায় জেলেটির মনে পড়ে গেল তার জাহাজী বন্ধু-বান্ধবদের কথা। তারও তো জানাশোনা অনেক জাহাজী বন্ধু আছে! সে তখনই তাদের কাছে গিয়ে আমেরিকা যাওয়ার সব খোঁজ খবর নিয়ে এসে হামিদকে বল্লে—"হামিদ, এই দেওয়ালীর দিনেই আমার এক বন্ধু ডিঙ্গি ভাসাবে। সে যাবে আফ্রিকা, যা না তুই এর সঙ্গে চলে। তারপর চরণরথে আফ্রিকার মরুভূমি পার হয়ে আর একটা ডিঙ্গিতে কোনও রকমে চড়ে বসলেই তো আমেরিকা। এখান থেকে আফ্রিকা যত দূর, সেখান থেকে আমেরিকা আবার প্রায় ততটা দূরই হবে।" হামিদ ভেবেছিল, জেলে তাকে বাধা দেবে, মানা করবে, তার বদলে এই উৎসাহ, এই প্রেরণা পেয়ে হামিদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে একটি বারের জন্যেও ভাবলে না, তার সুদূর যাত্রাপথের বাধা বিপত্তির কথা।

একে একে দিনগুলি কেটে গেল—এল 'দীপালী।' দেওয়ালীর দিন সহরের রোশনাই আলোকে পেছনে রেখে হামিদ নীল সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিলে।

সমুদ্রের বুকে রাতদিন ঢেউয়ের দোলা খেয়ে চার মাস পরে হামিদ নামল গিয়ে জাঞ্জিবারে। জাঞ্জিবার আফ্রিকার পূর্ব্ব দিকে একটি দ্বীপ। লম্বা প্রায় ৫৪ মাইল, চওড়া প্রায় চব্বিশ মাইল। এই দ্বীপের নামকরা যে সহর—তার নামও জাঞ্জিবার। ভারী সুন্দর সহর। লোকজন, বাজার-হাট—বেশ সরগরম। এসব দেখে আমাদের হামিদ ভাবলে কি হবে আর আমেরিকা গিয়ে! এই তো খাসা জায়গা! কিন্তু কি করে খরচ চালাবে সে? সম্বলের মধ্যে তো দুটি টাকা আর তিনটি গিনি। আসবার সময় সেই জেলে বন্ধুটি তার হাতে এগুলি দিয়ে বলেছিল "সৎ পথে থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে এর থেকে তিন হাজার গিনি তৈরী করতে চেষ্টা করো।" কিন্তু পেটের জ্বালায় হামিদ একটি একটি করে তিনটি গিনিই ভাঙ্গিয়ে খেলে। হাতের খুচরো পয়সা—তাও শেষ করে ফেল্‌লে। কাজেই মন তার খুব খারাপ হয়ে গেল। দিনরাত সে তখন সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—কি যে করবে কিছু ভেবে পায় না।

একদিন সে এই জাঞ্জিবারের রাস্তার ধারে বসে বসে ভাবছে নিজের অভাব এবং দুঃখের কথা! এমন সময় এক সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হল। এই সাহেব হামিদকে তার মোট বইতে বললে। মেঘের কোলে রোদ খেলে গেলে যেমনটি হয়, হামিদের

মনেও ঠিক তেমনটি হল। দুঃখের মাঝে দেখা দিলে আশার আলো। সে কথাটি না বলে খুশী মনে মোটটি বয়ে নিয়ে গেল সাহেবের বাড়ী, কারণ পয়সা পাবে এই আশায়। মোট নামিয়ে মজুরীর জন্য সে বসে আছে—কিন্তু কৈ, পয়সা দেবার নামটি নেই! মোট বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বেলা দশটায়; আর বেলা বারটা বাজলো তখনও পয়সা দেয় না কেউ। কাঁহাতক সহ্য করা যায়? তাই সে চটেমটে সাহেবের সদর দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়তে লাগলো। দরজা খুলে সাহেব দেখে—সকাল বেলার সেই কালা আদমীটা। কালা আদমীকে কাজের জন্যে মজুরী দিতে হবে! বলে কি। কাজেই যখন হামিদ তার পাওনা মজুরীটা চাইল, তখন লালমুখো সাহেব চোখ লাল করে ধরল তো ধরল একেবারে হামিদের কান। এ অপমান হামিদও যে চুপ করে হজম করবে তাও কি হয়! তাই হামিদ সাহেবটাকে পটাপট ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়ে দে ছুট একেবারে সহরের শেষ সীমানায়, সমুদ্রের তীরে।

পালিয়ে সমুদ্রের চড়ায় বালিতে পা ছড়িয়ে বসল,—মনে হোল পরাধীন আর গরীব যারা তাদের সমুদ্রের জলে ডুবে মরাই ভালো—হামিদ চোখের জল আর ধরে রাখতে পারে না, পয়সার যে অত্যন্ত দরকার। মোট বয়েও পয়সা তো পেলেই না—তার বদলে মিলল কি না অপমান, অশান্তির পসরা। অনেকক্ষণ সে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, সশরীরে দাঁড়িয়ে সেই সাহেব!

তবে কালা আদমীর হাতে চড় খেয়ে, যেন সাহেব আর ততটা লাল নেই। এদিকে হামিদও মরিয়া হয়ে উঠেছে। সাহেবকে দেখে সে একটুও ভয় পেলে না। হামিদ রাগে গর্জ্জে উঠলো আবার, হিন্দিতে বললে—"আমার পাওনা মজুরী দিস নি, মেরেছি তো বেশ করেছি।" সাহেব কিন্তু কিছু বললে না, হয়ত সাহেবের মনে তখন বিবেকের শাসানি। সে নিঃশব্দে হামিদের হাত ধরে উঠিয়ে তার পাওনার চেয়ে ঢের বেশী পয়সা দিয়ে যে রকম নিঃশব্দে এসেছিল, সেই রকম নিঃশব্দেই আবার চলে গেল। হামিদ তো অবাক!

সাহেবটাকে সে যতটা পশু ভেবে ছিল দেখলে তা তো নয়, শূয়োরের মত রাগী আর গোঁয়ার হলেও, মিষ্টি কথা বলতে না জানলেও হয়তো সে বুঝেছে যে, পরাধীন ভারতবাসীরও হাত আছে এবং তাদের সে হাতও কড়া। কিন্তু সাহেব যেভাবে শক্তির আদর করলে, তা দেখে হামিদের মন ভরে উঠলো—কারণ ক'জন মানুষ এমনি করে এই সাহেবটির মত নিজের ভুল বুঝতে পারে? মজুরী পেয়ে হামিদ খুশি হলো, কিন্তু পয়সা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাথায় দুর্ব্বুদ্ধি জুটলো এসে—সেদিনই সে জাহাজে করে 'দারেস সালেমে' চলে গেল। 'দারেস সালেম' টাঙ্গানিকার রাজধানী—আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে ভারতমহাসাগরের তীরে। সেখানে যাবার ক'দিন পরেই একদিন হামিদ চললো একটা জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়লো বটে, কিন্তু ভাবলেনা

একবারও যে, জার্মান ভাষা, ইংরেজী বা চল্‌তি হিন্দি—এসবের কোনটাই তার জানা নেই, তা ছাড়া আদিম অধিবাসীদের চলতি 'সোহেলি' ভাষা, তাও তো তার বোধগম্য হয় নি!

কদিন পথ চালার পর, জঙ্গলের পথে এক নিগ্রো গ্রামে এক জার্মাণের সঙ্গে হলো তার দেখা। সেখানকার প্রথা ছিল, সাদা চামড়ার লোক দেখলেই কালো লোকদের তাকে সেলাম ঠুকতে হতো। হামিদ তা' করে নি। এতেই জার্মাণ সাহেবটি খাপ্পা হয়ে উঠে। তাই সে নানা কথার অছিলা তুলে হামিদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। হামিদ কিন্তু ভয় পাবার লোক নয়—তা তোমরা আগেই টের পেয়েছ। সাহেব ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে গাল দিতে লাগল, কাজেই হামিদের রাগও গেল বেড়ে। শেষটায় এই সাহেব তাকে একটা ঘুসি মারতেই হামিদও তার জবাবে তাকে বিরাশী সিক্কার একটা চড় লাগিয়ে দিল। হাতা-হাতি থেকে রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি, সাদায়-কালোয় লড়াই! দেখবার মত বটে! ঝগড়া চরমে ওঠবার আগেই কয়েকজন নিগ্রো এসে হামিদকে ফেললে ধরে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে চালান দেওয়া হলো 'বানাসাউরীর' অপিসে। 'বানাসাউরী' হলো গাঁয়ের মোড়ল, বিচারক—এক কথায় বলতে গেলে—সবই। কাজেই বিচার সুরু হল তারই দরবারে। বোঝে না কেউই কারো কথা। অনেক জোর জুলুম করার পর—চেষ্টা চরিত্র করে বুঝলে তারা হামিদের মোট চারিটি কথা—মেরিকা, কলকাত্তা, মুছলমান, বাঙ্গালী।

বিচার হলো না। নানা রকমের দোভাষীয় দল মানে খুঁজতে বসল, কিন্তু কেউ হামিদের কথার মাথামুণ্ড কিছু বুঝল না। হামিদকে আবার বোম্বাই-এ চালান দেওয়া হলো। কারণ তার কাছে বিদেশে যাবার 'পারমিট্' ছিল না। তখনকার দিনে বিদেশে যেতে হলে পারমিট বলে একটা কাগজের দরকার হত। এইটেই বিদেশে যাওয়ার দলিল।

হামিদ এবার মাথা ঠিক করে বোম্বাই সহরে এসে এক বিলাতী জাহাজে খালাসীর কাজ নিলে। মনে মনে কিন্তু তার সেই পুরাণো মতলব—আমেরিকাতে পাড়ি জমানো। কিন্তু আমেরিকার বন্দরে জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়া ভারি শক্ত কাজ। এর পরেও তু'তুবার সে আমেরিকার মাটিতে পা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় নি। তিনবারের বার সে কৃতকার্য্য হয়েছিল—সফল হয়েছিল তার স্বপ্ন। তার এমনিধারা ডান-পিটেমীর গল্প আরও অনেক আছে, কিন্তু সব একদিনে বলা সম্ভব নয়। হামিদ এখন আমেরিকাবাসী, তার জীবনের ধারা বদলে গিয়ে সে একেবারে অন্য মানুষ। মানুষ যে চেষ্টা করলে নিজেকে কত উন্নত করতে পারে তা হামিদকে দেখেই বুঝেছি।

ফ্রিস্কো সহরের এক ধারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে সে এখন, তার তুটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারাও লেখাপড়া শিখে কাজ-কর্ম করে হামিদকে দেখিয়ে দিয়েছে যে—তারাও বাপের মতই কাজের লোক। মানুষের মত মানুষ হয়েছে তারাও। এতেও হামিদ কিন্তু গর্বে ফেটে পড়ে নি। আগের মত সে রয়েছে,

তা না হলে সে কি তার এই দুঃখকষ্টময় গল্পটি আমার মত ভবঘুরের কাছে অমনি করে বলতে পারতো? এতে তার মান কমে নি—বেড়েছে। তোমরা একটুতেই যে কত মান অভিমান করো, তার নমুনা পেয়েছি। আশা করি, এখন থেকে 'মান' অভিমান কমিয়ে শক্তি আর সাহস বাড়াবার চেষ্টা করবে।

ভয় কর জয়—নইলে কিছুই নয় !

অষ্ট্রীয়ার একটি ছোট গ্রামে একদিন দুপুর বেলা ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এক কফিখানার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাইসাইকেলটা রেষ্টোরেন্টের বাইরে রেখেই ভিতরে গিয়ে এক পেয়ালা কফির অর্ডার দিলাম।

আমি যখন আরাম করে কফি খাওয়ায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ বাইরে সাইকেল পাংচার হবার একটা ফোঁস্ শব্দ শুনলাম। আমার সাইকেলের চাকাটা লিক্ বা ছাঁদা হয়ে গেছে কিনা দেখবার জন্য বাইরে এসে দেখি, একটি বারো তেরো বছরের ছেলে সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে হাত পা নেড়ে ইসারা করে বল্লে যে, চাকার ভালভ্‌টা সে টেনে বার করতে গিয়ে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে, টিউব ফেটেছে। আমিও জানতাম, টিউব যখন পুরানো হয়ে যায়, তখন হঠাৎ ভাল্‌ভ্‌ বের করলে টিউবও ফাটতে পারে। তোমরা যদি এই কাজটি করতে তবে এই অষ্ট্রীয়ান ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকতে কি ? নিশ্চয়ই চম্পট দিতে। আর আমিও যদি ধরতে পারতাম, তবে গালে ঠাস্ করে একটা চড়ও হয়তো মেরে দিতাম। কিন্তু স্বাধীন দেশেতো তা হবার যো নেই ! ছেলে-

মেয়েকে রাস্তা ঘাটে যদি কেউ শুধু শুধু মারে, তা'হলে আইন অনুসারে তাকে পেতে হয় সাজা, কোর্টে হয় জরিমানা।

ছেলেটি আমাকে দেখে একটুও ভয় পেলে না উপরন্তু এমন সাহসের সঙ্গে তার নিজের দোষ স্বীকার করলে যে দেখে আমি অবাক্! তখনই সে আমার হাত ধরে তার কাকার দোকানের দিকে নিয়ে চলল। আমাদের দেশে যদি ঐ রকম দোষ স্বীকার কর, তবেতো আর রক্ষে নেই! চোখ পাকিয়ে তখনই জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন করেছো? তার জবাব আর কি তখন তোমরা সত্যি কথায় দিতে পার? কাজেই মনগড়া হু'চারটা মিথ্যা কথা বলবে, কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ, মিথ্যা কথাও তো তেমন ভাল করে তৈরী করতে পার না। অতএব তখন এই মিথ্যা কথার অছিলা ধরে বেশ ঘা হু'চ্চার পড়ে গুরুজনের দয়ায়। সবাই না হোক আমাদের দেশের শতকরা আশীজন মা-বাপ শাসন বলতে বোঝেন—কারণ অকারণ বিচার না করেই ছেলে-মেয়েদের মারধর করা। আর তা আমি ভাল করেই জানি। কারণ ছোট বেলায় তোমাদের চেয়ে একটু বেশী লক্ষ্মী ছিলাম। শুধু কি তাই, অনেক স্কুলমাষ্টারও দেখেছি, যাঁরা ছেলেমেয়েদের দোষ স্বীকার করার পরও চাবুক লাগানো বন্ধ করে না। এই ধরণের আড়বুঝো মাষ্টার মশাইরা তোমাদের মিথ্যাকথা শেখবার সুযোগ দেন বলেই আমার ধারণা। বিদেশের ছেলেরা মাষ্টার দেখে ভয় করে না, কারণ মাষ্টাররা তাদের সঙ্গে খেলা করে, গান করে, পিকনিক পার্টিতে যায়, আবার দরকার হলে শাসন

ক'রে বুঝিয়ে বলে দেয়, তার ভুল বা দোষ কোথায়। কাজেই ছেলেটির হয়েছে অমনি সাহস, সে আমার কাছেও ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে নারাজ !

ছেলেটি গিয়ে তার কাকাকে সব কথা পণ্ডিতের মত বুঝিয়ে বললে। তার কাকা তখনই আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং আমার টিউব মেরামত করে দিলেন। ছেলেটির কাকা ছেলেটিকে কিছুই বললেন না, শুধু হেসে আমাকে বললেন—তার ভাইপো ভবিষ্যতে যে একটি মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার হবে, এটা যেন, আমি জেনে রাখি। এখন বুঝতে বোধ হয় পেরেছ, ভয় কত বালাই ! স্বাধীন দেশের মানুষের মত হতে হলে সব চাইতে আগে ভূতের ভয়, মাষ্টারের ভয়, মা-বাবার বকুনির ভয়, যা কিছু ভয় মনে আস্তানা গেড়েছে, তা দূর করতে হবে।

স্বাধীনের নেই মরণ ভয়

সাংহাই সহরে আমি থাক্‌তাম চীনা সহরে। চীনা সহরের ভালো নাম 'চাপাই'। হোটেলে জায়গা পাইনি, কারণ আজ কাল সাংহাই সহরে হোটেলেই থাকে বেশী লোক। ইউরোপী-য়ান, চীনা, জাপানী, ইণ্ডিয়ান, আমেরিকান সকলেই চায় একটু আরাম করে ভাল জায়গায় থাক্‌তে, অবিশ্যি যাদের টাকাকড়ি আছে। আমার কাছেও যে হোটেলে থাকবার মত টাকাকড়ি ছিল না, তা নয়, কিন্তু হোটেলে জায়গা পেলাম না এই জন্য যে, কোরিয়া থেকে যখন জাহাজ বন্দরে এসে লাগল, তখনই আমি হোটেলের কথা একদম ভুলে গিয়ে—"চাপাই" সহরে বোমার ঘায়ে ভেঙে-পড়া ঘরবাড়ী ইমারৎ দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়লাম, তাতেই অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম। ওদিকে ঐ ফাঁকে হুঁসিয়ার যাত্রীদল হোটেলের খালি ঘর যা ছিল সব ভর্ত্তি করে ফেললে।

অনেক পরিশ্রমের পর সারাদিন ঘুরে ফিরে বিকালের দিকে একটা মামুলী ধরণের ঘর ভাড়া করেই কোন রকমে রাতটা কাটালাম। পরের দিন সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়ে জানলাম যে, আমার ঘুম ভাঙ্গবার আগেই চারধারের রাস্তার ফুটপাথ থেকে মেলাই ছেলে বুড়োর মরা দেহ কুড়িয়ে কবর দেওয়ার জন্যে বাইরে পাঠানো হয়েছে। কোন্ ফুটপাথ থেকে

কোন্ রাস্তা থেকে তাদের কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, আর কেমন করেই মরল এরা, তাই জানবার জন্য উৎসুক হয়ে বেরিয়ে পড়্লাম। দেখলাম, বড় বড় রাস্তাগুলি একদম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মরা লোক তো দূরের কথা, একটা আধমরা লোকও দেখতে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, হতে পারে এ সব বাজে খবর! কাজেই নিরাশ হয়েই ফিরলাম।

বিকালে ছোট ছোট অলিগলিতে বেড়াতে গেলাম। আমার ভুলও ভাঙ্গলো তখন। যে খবর মিথ্যে বলে ভুল করেছিলাম তা যে কতদূর সত্যি নিজের চোখে তার প্রমাণ পেলাম। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ছেলে-বুড়ো মেয়ে সবাই সেই সব ঘুপ্সি সরু সরু গলিতে একসঙ্গে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাদের মাথার উপর ঝির্ ঝির্ করে অনবরতই বৃষ্টি পড়ছে। এত ঠাণ্ডা যে জলও বোধ হয় সেখানে বরফ জমে যায়। কাজেই, এমনি করে বৃষ্টিতে ভেজাটা ভাবতো কত মারাত্মক! এতে কি নিউমোনিয়া না হয়ে যায়? অনেকে দেখলাম দস্তুরমতো কাঁপছে। কারও কারও কাশির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেছে।

এরা কত দিন যে খায়নি তা কেউ বল্‌তে পারে না। কোত্থেকে এসেছে কেউ জানেও না। তাদের দরদে দরদী কেউ নেই। কোনো সাহায্য তারা কোনো দিন পায় না। তবে আন্তর্জ্জাতিক এলাকায় (International settlement) সস্তায় চাল-ডাল বিক্রি করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু

এদের কাছে পয়সাই নেই, তা সস্তা দরের চাল-ডাল কিনবে কি করে বলতো! এছাড়া পাদরীরা 'বুভু' অর্থাৎ ভাতের মাড় বিলোবার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এদের তো নিয়ে আসবার মত নড়বার শক্তিই নেই। না খেয়ে না খেয়ে মানুষগুলো হয়ে গেছে শুকনো লতাটির মতো, যেন তারা অপেক্ষাই করছে মরণের জন্য। চোখের সামনে এমনিধারা করুণ দৃশ্য কতক্ষণ দেখতে পারে একটা মানুষ? আমার মত শক্ত মানুষও আর পারলো না সে দৃশ্য দেখতে, তাই অন্য কিছু দেখবার জন্য আর একটা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলাম।

একটা ছোট্ট গলি, বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে কতকটা গিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে দেখি আড্ডা নিয়েছি কতকগুলো রিক্সওয়ালা। গুণে দেখলাম তারা অন্ততঃ জনাপঁচিশেক হবে। অনেকেরই বয়স ঠিক করতে পারলাম না। তাদের কারুর শরীরেই গরম কাপড় নেই। যেটুকু কাপড়-জামা অঙ্গে আছে তাও গেছে ছিঁড়ে। অনেকেই শুয়ে আছে মাটিতে মড়ার মত। ওঠবার শক্তি নেই, তাদেরও শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে মরণ। তারাও যেন মরণকেই বরণ করে নিয়েছে। আমার সঙ্গী ছিলেন এক বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু। তিনি বল্লেন, "ওষুধ দিয়ে আর কি হবে! ওদের পেটে ভাত নেই, গায়ে কাপড় নেই, ধমনীতে নেই রক্ত, ওরা মরবেই। চলুন এগিয়ে যাই।"

ভেবে বলতো এরা কারা? আর এদেরই বা এমনি দুরবস্থা কেন?

সেই কথাটাই শোনো এবার—চীনের সঙ্গে জাপানের প্রচণ্ড যুদ্ধ চল্‌ছে। যে যে দিকে পারছে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ভেবেছে পালালেই প্রাণ বাঁচবে, কিন্তু দেশের মাটির মায়া ছেড়ে, তার মান মর্য্যাদা না বাঁচিয়ে যারা পালিয়ে এসেছে তাদেরই ত্নর্ভিক্ষ রাক্ষসী মরণ কামড় কামড়িয়ে দফারফা করেছে। পালিয়ে ওদের কোনই লাভ হচ্ছে না। জাপানী সেপাইরা কাউকেই বাদ দিচ্ছে না। অপরের কৃপা করুণা তাদের মরণকে ঠেকাতে পারছে না। প্রবাদ আছে, "রাজ ভয়ে, মারী ভয়ে য পলায়তে স জীবতি"। আজকাল আর চলে না!

যুদ্ধের ভয়ে পালিয়ে গেলেই আজ, প্রাণ বাঁচবে না। বাঁচতে হলে সাহসী হতে হবে যে কতখানি, তা দেখে এসেছি চীনে। সেটা হচ্ছে সেখানে সাংহাই থেকে তিন মাইল দূরে স্বাধীন চীনে, সেখানে দাঁড়িয়ে লড়ছে তারাই, যারা পালায়নি—তারা হাসছে। মাঝে মাঝে দেশী সিগারেট ফুঁকছে। যখন জাপানীদের আক্রমণ হচ্ছে, তখন তারাও তার পাল্টা জবাব দিচ্ছে। হয় মরছে, নয় কাজ শেষ করে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। বিপদকে ভয় করে পালালে অথবা প্রাণপণে চীৎকার করলে ফল কিছুই হয় না, বরং লাভের মধ্যে আরও ত্নর্ভোগে ভুগে মরতে হয়। একথা আমি শিখে এসেছি স্বাধীন চীনের কাছ থেকে—তোমরাও তাই শিখো, দেশের বিপদে দেশকে ছেড়ে পালিও না।

মনের জোরেই বিশ্বজয় !

তোমরা অনেকেই হয়ত শ্যাম দেশের নাম এবং সেই দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। শ্যাম দেশের ইংরেজী নাম হলো Thai Land. শ্যাম দেশের বাসিন্দারা তাদের নিজেদের ভাষায় লেখে "থাই দেশ" অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের দেশ। স্বাধীন মানুষ কি আর কোনও দেশে নেই নাকি! ভাবলুম তবে স্বাধীন মানুষ বলে লাভ কি? কথাটা নিয়ে মাথার মধ্যে রীতিমতো তোলপাড় সুরু হয়ে গেল, তাইতো কি করে কথাটার সৃষ্টি এবং তার কি-ইবা বিশেষ মানে! তাই জানবার জন্যে মন উস্‌খুস করতে লাগল।

জানইতো আমার ভবঘুরে বৃত্তি। আমাকে না ডাকলেও আমি হাজির হই। কথা আমার সঙ্গে না বল্লেও আমি সেধে গিয়ে আলাপ জমাই। তাই একদিন ঠিক সেইভাবেই শ্যাম দেশের এক পাঠশালায় গিয়ে হাজির হলাম। মাষ্টার মশাই তখন দাঁড়িয়ে বোর্ডে কি লিখছিলেন, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলাম। নতুন মানুষ, অদ্ভূত চেহারা, দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আমার মুখের দিকে কোন ছেলেই চেয়ে দেখল না! তাদের জ্বলজ্বলে চোখগুলো বোর্ডের উপর কি যেন লক্ষ্য করছিল—অন্যদিকে একদম খেয়াল নেই আমি

তাদের সেই ভাব দেখে বুঝলাম যে ওদের একাগ্রতাটা বেশ আছে। তারপরই মাষ্টার মশায় বোর্ডে লেখা যখন থামালেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। মাষ্টার মশাই আমার সঙ্গে কথা বল্লেন। তিনি তার দেশী ভাষায় জিগ্যেস করলেন—"মাতে নাইয়া" মানে "কোথা হতে আসছেন?" আলাপ পরিচয় হবার পর কথায় কথায় জিগ্যেস করলাম, এদের এত একাগ্রতা হলো কিসের ফলে? এটা কি লেখাপড়া শেখার ফল না আপনার একাগ্র শিক্ষকতা? মাষ্টার মশাইতো আমার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন।—"সে কি! ছেলেদের মন যদি একাগ্র না হয়, তবে লেখাপড়া শিখবে কি করে? একাগ্রতাইতো শিখতে হয় প্রথম, তার পর লেখাপড়া।"

বুঝলাম কথাটাতো ঠিক! কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো; পাঁচ-ছ' বছরের খোকা-খুকুদের জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয় পড়তে—মন থাকে না পড়ার বইয়ে, তবু তাকে পড়তে হয় চোখরাঙানী আর বেতের ভয়ে, একাগ্রতা কোথা থেকে এদের হবে বলোতো?

আমি ছোট বেলায় পাঠশালায় যাই নি। পাঠশালায় গিয়েছিলাম আট বছর বয়সে; অতএব পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় গিয়ে খোকারা যে কেমন করে দিন কাটায়, তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, তবে বুঝতে পারি ওদের সময় সেখানে ভাল কাটে না। খুব ছোট ছোট খোকা-খুকুরা কেমন একমনে খেলা করে দেখেছ, আবার এও দেখেছ যে, যখন তারা কিছু

ভাঙে বা গড়ে, তাও করে তারা এতো মন দিয়ে যে, কোনও দিকেই খেয়াল থাকে না। এতেই বুঝতে পারা যায় জ্ঞান হবার আগেই খোকা-খুকুদের মনে থাকে একাগ্রতা, যদি সেই একাগ্রতাটাকে বাড়িয়ে দেবার সুবিধা দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে—যে কোন কাজেই তাদের সেই একাগ্রতা দেখতে পাওয়া যাবে। সেই জন্যই শ্যাম দেশে যাতে ছেলেমেয়েদের একাগ্রতটাই আগে বাড়ে, 'সেই চেষ্টা করেন। তাঁরা খুব ভাল করে জানেন যে, ভয় দেখিয়ে কারো একাগ্রতা বাড়ান যায় না, খেলাধূলা ও লেখাপড়ার মধ্যেই একাগ্রতাকে বাড়াবার সুযোগ সুবিধা দিতে হয়, ভালবাসার আড়াল ও শাসনে রেখে।

আমাদের দেশে খুব ছোট ছোট খোকা খুকিরা দেখেছি শ্লেট, পেনসিল আর বর্ণপরিচয় নিয়ে স্কুলে যায়। শ্যাম দেশে কিন্তু তা নয়। তারা স্কুলে যায় তাদের খেলনা-পত্তর, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাটা কাগজ, ভাঙা বাক্স প্রভৃতি নিজস্ব সম্পদ নিয়ে। সেখানকার ছোটদের স্কুলগুলো ভারি মজার, ঘরের ভেতর বেশ সুন্দর ঢালা বিছানা পাতা, তার উপর একপাল খোকাখুকু কখনও খেলছে, কখনও একে অন্যকে কামড়াচ্ছে, আর কখন বা কাঁদছে; ক্লান্ত হলে কেউবা সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ছে। আপন মনে ছোটদের এই যে খেলা, এই খেলাটাই হলো ছেলেবেলার মন একাগ্র করবার প্রথম উপায়, মন একাগ্র হলে তখনই তারা সুদক্ষ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে করে জ্ঞান উপার্জ্জন।

ঐ শ্যাম দেশেই একদিন বনের ধারে একটি লোককে একলাটি বসে "দরজা" তৈরী করতে দেখলাম। ঐ গভীর বনে সে একলা, সঙ্গে তার কেউ নেই, তাই আমার ভারি ইচ্ছা হলো লোকটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে গভীর বনেই রাতটা কাটাই, ঐ রকমই তো আমার উদ্ভূট্টী খেয়াল। কাছে গিয়ে বসে আমার পরিচয় দিলাম, সে আমার পরিচয় পেয়ে যেন ভারি খুশি হলো, দুজনে খুব গল্প জমলো। গল্প যখন সে করছিল, তার চোখ এবং হাত ব্যস্ত ছিল দরজা তৈরীর কাজে। কথায় বার্ত্তায় যতদূর জানলাম, লোকটি এসেছে ঐ বনে একখানা ঘর তৈরী করতে। তার খেয়াল বনের মাঝে ঘর তৈরী করে সে সেখানেই থাকবে। তার সঙ্গে আছে একখানা দা, একখানা কুঠার, একটা কোদাল আর একটা মশারী, তাছাড়া আছে খাবার জন্য সামান্য ভাত আর শুঁটকী মাছ।

বুঝলাম যে এও আমার মত কোন খেয়ালী মানুষ। যাক্ সন্ধ্যা হতেই তার কাজের শেষ হলো। দুজনে ভাত খেয়ে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। লোকটি বল্লে সে নাকি শ্যাম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষা ভালই জানে, শুনেতো অবাক্! তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, চাকরী বাকরী নেই বলেই বুঝি এই অদ্ভূত খেয়াল? সে বল্লে, "আজ্ঞে না চাকরীর জন্যে ততটা ব্যস্ত নই, চাকরীতো করতেই হবে, পরাধীন হবার আগে

আপনি খেটে যদি একখানা কুঁড়েও তৈরী করতে পারি, তবে সেই কুঁড়েতে থেকেও সারাজীবন আরাম পাব। চুপচাপ বেকার হয়ে বসে থাকার চেয়ে বন কাটলেও আনন্দ। যার কথা বললাম, তার বয়স কতো জান? মাত্র উনিশ বছর। কুড়ি বছর হলেই তাকে পল্টনের খাতায় নাম লেখাতে হবে, সব স্বাধীন দেশেই এই ধরণের একটা ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে এমনি একজন গ্রাজুয়েট বার করতো, যে নিজে হাতে জঙ্গল সাফ করে একলা অমনি ধারা একটা কিছু গড়বার চেষ্টা করছেন। কোথা থেকে আসবে তাদের সে ইচ্ছা? তাদের যে একাগ্রতা বা একনিষ্ঠা বলে কোনও জিনিষ নেই। যাদের মনে একাগ্রতা থাকে, তাদের কাজে আপনা থেকেই উদ্দীপনা, শরীরে বল আসে মনে দেখা দেয় সাহস। তাই বলি, এখন থেকে যা করবে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে করবে—ফাঁকি দিও না, তাহলে ফাঁকি পড়বে।

মরুর দেশেও মধু মেলে

আমাদের দেশে যখন পূজা পার্ব্বণ আসে তখন চার ধারে যেন একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। যার সাজবার সামর্থ আছে, সে তো কি কি জিনিষপত্র কিনবে তারই ফর্দ নিয়ে, ব্যস্ত, যাদের সত্যিই সাজবার ক্ষমতা নেই, তারাও সাজবার জন্য তৈরী হয়; কারণ পূজো পার্বণে না সাজলে কি চলে? আর সবহারার দল, যাদের সম্পদ আর সম্বল বলতে কিছুই নেই তারা শুধু এই সাজ সাজ রবের সাড়া শুনেই দিন গুণছে। কি করবে বেচারারা! কাজেই যে যার ভাগ্যি আর কপালকে দোষ দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা, মাদুর পেতে ছাদের উপর শুয়ে আছি আর দেখছি চাঁদটা যেন ছুটে চলেছে অজানা দেশের উদ্দেশে। চাঁদ, এমন যে চাঁদ তার নামের গোড়ায় কি বিশেষণ দেওয়া যায়, তাই নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, শেষটায় খেয়াল হলো, চাঁদ যে স্নিগ্ধ আলো আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে তাওতো তার নিজের নয়! অন্যের কাছ থেকে আলো ধার করে নিয়েই দিচ্ছে সারা পৃথিবীকে আলোয় আলো করে! তাইত! যার কিছু নেই সেও স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা পৃথিবীর উপর, আর এই পরবের আনন্দের সময় দেশবাসীকে কিছুই দিতে পারছি না। লজ্জায় আর ক্ষোভে আমার মুখটা গম্ভীর হলো,

চোখ দুটো হলো স্থির, তারপর আমি মনের পাখা মেলে নানা জায়গায় বেড়াতে লাগলাম, কত সহর কত সমুদ্র, পাহাড় পর্বত পার হয়ে শেষটায় গিয়ে হাজির হলাম একটা মরুভূমিতে। মনে পড়ে গেল পুরাণো দিনের কাহিনী, চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি ছবি।

সেদিন ছিল দ্বিতীয়া, আমি ছিলাম মরুভূমির দেশে বেদুইনদের আড্ডায়। তাদের ভাষা আমায় জানা ছিল না, আমার ভাষা তাদেরও জানা ছিল না, কাজেই আমি চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম তাদের মাঝে। তখন 'রমজান' মাস, তাদের আনন্দের দিন 'ঈদ' এসেছে। তারা আনন্দ করছে সন্ধ্যার চাঁদ দেখবে বলে। আমার মুখে কথা নেই, আর আনন্দ নেই দেখে বেদুইন ছোকরারা আর আধাবয়সীর দল একটা কি যেন শলাপরামর্শ করলে, তার পরে তারা সরু তার দিয়ে একটা একতারার মতো তৈরি করে পাশের ছোট ছোট বেদুইন ছেলেদের হাতে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বোধ হয় বলেও দিলে আমার কাছে এসে বাজাতে। তারা তো মহানন্দে আমাকে ঘিরে একতারা বাজিয়ে আরবী ভাষায় গান গাওয়ার সঙ্গে নাচও জুড়ে দিলে। সে গানে না ছিল কোন সুর, না ছিল কোন তাল-মান-লয়ের বালাই। ছেলেরা অনেক বাজালে, গাইলে নাচলে, কিন্তু আমায় মুখে হাসি কিছুতেই এলো না। তারা আমাকে খুশি করতে না পেরে নিরাশ হয়ে পড়লো, শেষটায় ছুটে গিয়ে তাঁবু থেকে খেজুর এনে আমাকে খেতে

দিলে। খেজুর মাত্র তিনটে, অথচ ছেলে মেয়ে আর আমাকে নিয়ে লোক হচ্ছে মোট বারো জন। আমি ভাগ বাঁটোয়ারা করে সকলকে খেতে দিয়ে নিজেও এক টুকরো খেলাম, ভাবলাম, হাসি না পেলেও এবার হাসতে হবে। কারণ তা না হলে এদের চাঁদ দেখাটা মোটেই আনন্দের উৎসব হবে না।

হাত-মুখ ধুয়ে একটা বেসুরো গান ধরলাম, এবং তাদের আনন্দ দেবার জন্য অনেকক্ষণ মনের আনন্দে গলা ছেড়ে চেঁচালাম। গান শেষ করে বেদুইন প্রথায় কতক্ষণ নাচলাম ভালুক নাচনের নাচ। তারপর সুরু হলো দেঁতো হাসির পালা, অনেকক্ষণ হাসতে হলো। মনে হলো বেদুইন ছোকরারা আর বুড়োর দল আমাকে খুশি দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, তাই বুঝি "রহমানে রহিম" বার বার বলতে লাগলো। কেউ কেউ 'রফিক' বলে বুকে জড়িয়ে ধরল আমাকে। সন্ধ্যায় যখন তারা আকাশের কোণায় এক ফালি চাঁদ দেখতে পেলে তখন আরও খুশি হয়ে আমাকে দুম্বার মাংসের তৈরি বড় বড় দুটো কাবাব খেতে দিলে। সারাদিন উপবাসের পর তখনও কিন্তু তারা নিজেরা কিছুই খায়নি, আমি অতিথি বলে আমাকে প্রথমে খেতে দিলে। তারপর রাত দুটো পর্য্যন্ত নাচগান চললো। আর আমি বিদেশী বিধর্মী হয়েও তাদের আনন্দে যোগ দিয়েছিলাম বলে তারা যে কতো খুশি হয়েছিল তাও বুঝতে পেরেছিলাম। পরদিন ভোর না হতেই নামাজ পড়ে তারা আমাকেই সবপ্রথম আলিঙ্গন করেছিল, আমার ধর্ম, আমার জাত

তারা জানত না। শুধু জানত আমি বিদেশের এক 'মুসাফির'। তাদের আনন্দের দিনে আমাকে নিরানন্দে ফেলে তাদের আনন্দ হতে পারে না এভাবটি তাদের ব্যবহারে সেদিন স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। বন্য অসভ্য বেদুইনদের উৎসবে যে উদারতার পরিচয় আমি সেদিন পেয়েছিলাম, সেই কথাই বার বার মনে হচ্ছে পূজোর আনন্দ বৎসবে। এই ত সভ্য শিক্ষিত লোকের পূজো এসেছে, পূজোর আমোদে তারা হয়ত এমনই মত্ত হবে যে, পাশের ঘরের লোক খেয়েছ কি না খেয়েছে, বেঁচেছে কি মরেছে সে খোঁজও তাদের রাখবার সময় হবে না। কারণ তাদের পূজোর আনন্দে তারা মত্ত। মৌচাকে এতদিন ধরে মধু যোগাতে তো পারি নি, যুগিয়েছি হলাহল এবং আজও তাই মিষ্টি কথা না-বলে বলছি, আমার তেঁতো মনের তেঁতো কথা— তোমাদের সাজ গোজের মধ্যে ডুবে থেকে তোমরা স্বার্থপরের মতো আনন্দ করবার চেষ্টা করো না, তাতে সত্যিকার আনন্দ নেই, পারো যদি অপরের মলিন মুখে হাসি ফোটাতে, দুঃখী-জনের আনন্দ বাড়াতে, তবেই তোমাদের পূজোর উৎসবে আমাকে পাবে। তা না হলে বিদেশী লাল নীল পোষাক পরে পরাধীনতার দুঃখবাহী সঙের নাচ নেচোনা, তাতে আমি কষ্টই পাব।

আলোয় ভরা কালো ছেলে

এই পৃথিবীতে কত লোক কত রকমে তাদের দেশের ও তাদের জাতির উন্নতির চেষ্টা করছে তা দেখে এসেছি বিদেশে। বিশেষ করে সে সব দেশের তরুণ তরুণীরাই এ বিষয়ে অগ্রণী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আছে তাদের সঙ্গে। খেলা ধুলোর সঙ্গে তারা লেখাপড়া করে তোমাদের মতই, কিন্তু তারা তাদের সমাজকে ভুলে থাকে না। সমাজব্যবস্থা বলতে এদেশে ওটা বুড়োদেরই একচেটে ব্যাপার, ওসব দেশে কিন্তু তা নয়, সমাজের রীতিনীতি গড়ে নতুন মানুষরা। আজ আমি যে নিগ্রো তরুণের কথা বলব, সে যে কি রকম কাজের লোক, তার নিজের নিগ্রো সমাজের উন্নতির কাজে তার যে কি অসীম আগ্রহ, তা এই গল্পটি শুনেই বুঝতে পারবে।

তার নাম জেরী, জন্ম তার আলাবামার একটি বন্দরে। আলাবামা হলো ইউনাইটেড স্টেটসের একটি প্রদেশ। এই এই প্রদেশটিতে নিগ্রোদের উপর ভয়ানক জোরজুলুম ও অত্যাচার হয়। অত্যাচার বলতে আমরা বুঝি অনর্থক মারপিট করা, বিনা বিচারে জেলখানায় ধরে নিয়ে কষ্ট দেওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু জেরী এ সবকে অত্যাচার বলেই মনে করে না, তার মনে অসাধারণ সাহস কিন্তু বয়স তার এখন পনেরো বছরের মত। তার সঙ্গে আমার দেখা হয় কালিফোর্ণিয়ার ষ্টকটন সহরে।

ষ্টকটন হলো লাহোরের মত একটি ছোট্ট শহর। লোকসংখ্যা হবে সেখানে আট লাখ। আর দিনের বেলায় হবে চার লাখ। রাত্তির বেলা লোকসংখ্যাটা বেড়ে যায়, কারণ জুয়া খেলার জন্যে নানান শহর থেকে অনেক লোক আসে। সকাল বেলায় আবার যে যার ঘরে চলে যায় কাজ করবে বলে। যদি তোমরা কেউ রাত্তির বেলা ষ্টকটন শহরের মোটর-ষ্ট্যাণ্ডে যাও, তাহলে দেখবে মোটরকার যেখানে পার্ক করা হয়, সেখানে হাজার মোটর গাড়ী পড়ে আছে। কারণ আমেরিকায় মজুরদেরও অনেকের মোটর গাড়ী আছে। সেখানে মোটর গাড়ী বেশ সস্তা; আরে তাছাড়া সেখানকার মজুররাও বেশ বড়লোক। আমাদের দেশের মজুরদের মত গরীব তারা নয়। সেখানে পুরাণো অর্থাৎ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী আমাদের দেশের পঁচাত্তর টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে ঝাড়ুদারের কাজ যারা করে, তারা দিন-মজুরী কত পায় তা জানি না, তবে আমেরিকার ঝাড়ুদার যেদিন কাজ করে, সেদিন আটঘণ্টা কাজ করার পর তাকে দেওয়া হয় বার টাকা। জেরীও এমনি একটি ঝাড়ুদার। তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ষ্টকটনের একটি জাপানী হোটেলে।

তোমরা বোধ হয় জানো কলকাতায় মেছুয়াবাজার ছিল, চোর ডাকাত আর গুণ্ডাবদমায়েসের আস্তানা। ষ্টকটনও সেই ধরণের যায়গা। আমিও ষ্টকটনে ইচ্ছা করেই সেই গুণ্ডা-বদমায়েসের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম তাদের রকম

সকম আর মজা দেখবার জন্যে। জেরীর সঙ্গে যখন কথা হলো, সে বল্লে আপনার মত একজন পর্য্যটকের এরকম একটা ওঁছা যায়গায় আসার মানে বুঝলাম না। আমি বল্লাম— যাও গিয়ে জিজ্ঞাস করো হোটেলের ম্যানেজারকে, তিনিই বলে দেবেন তোমাকে সব কথা। সে তখ্খুনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জেনে এসে আমাকে জিগ্যেস করলে —আচ্ছা বলুন তো নিজে ইচ্ছে করে এত কষ্ট করছেন কেন? এদেশে হিন্দুর আর আমেরিকানদের তো একই অধিকার, তবুও কেন কষ্ট করছেন? জেরীকে আমার কষ্টের কারণ বুঝিয়ে দিতে বড় বেশী সময় লাগল না। তাকে বললাম— 'হিন্দু' 'হিন্দু' করে করে আমার প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়েছে; এখন আর আমি হিন্দু নাই, এখন আসলে আমি কালো মানুষ। যে যেভাবে আমাকে গ্রহণ করে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এতে আমার মুখ বা মনের রঙ বদলী হয় না, তবে ছন্নছাড়া জীবনে মেজাজখানি বহুরূপী না হয়েতো আর পারে না।

জেরীর কাছে কথাগুলো বিগড়ানো মেজাজের বেসুরো সুর বলেই ঠেকল। সে তার নিজের কষ্টের কথা বলে আমাকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে—তারা হোটেলে ঢুকতে পারেনা, সাদা চামড়ার স্কুলে পড়তে পারে না—চাকরীতে সাদা চামড়াদের যে হারে মাইনে দেওয়া হয়, তারা সেই হারে মাইনে পায় না। আমি তার দুঃখের

কথা শুনে মনে মনে হাসলাম। মনে হলো আমার নিজের দেশের ও জাতির কথা, কিন্তু কথা না বলে চুপ করেই রইলাম।

এমনধারা চুপটি করে বসে আছি দেখে জেরী আমায় বলতে সুরু করলে,—সে কালিফোর্ণিয়াতে এক নূতন সঙ্ঘ গড়েছে, তার সভাপতি সে নিজেই। এই সভার কাজ হলো নিগ্রোদের ভেতর ভাল ভাল সাহিত্যের প্রচার, দুঃখ দারিদ্র্য যাতে দূর হয় তার চেষ্টা, আর তার জাতভাইদের চরিত্র যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যে প্রাণপাত করা। সেই মতলব নিয়েই,—ইচ্ছা ক'রে সে এই নোংরা যায়গায় ঝাড়ুদারের কাজ নিয়েছে, কারণ এখানকার ঝাড়ুদাররা তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যা কিছু পয়সা পায়, তা মদ খেয়েই উড়িয়ে দেয়। কোন ভাল কাজ করে না, ভাল বই পড়ে না। জীবনভর একগাদা গ্লানি বয়ে বয়ে এমন হয়ে গেছে তারা যে, প্রাণটাকে আঁকড়ে রাখার চেয়ে বেশী ওরা আর কিছু বোঝে না।

তোমাদের জানা নেই হয়ত যে, আমেরিকার কোন শহরই কলিকাতার মত অপরিষ্কার থাকতে পারে না। অবশ্য বিনি পয়সায় সে কাজটা হবার নয়, সেজন্য স্যানিটারী বিভাগকে বেশ কিছু খরচ করতে হয়। তারা তাদের দুঃখকষ্টের কথা শোনে এবং প্রতিকারও করে থাকে। কাজেই ঝাড়ুদারদের ভেতর বড় একটা ধর্ম্মঘটও ঘটে ওঠে না। আমেরিকার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আর ঝাড়ুদারের মাইনেতেও সে রকম তারতম্য দেখা যায় না। তারও একটা কারণ আছে।

প্রত্যেকটি ঝাড়ুদার আমাদের দেশের ম্যাট্রিক পাশ করার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে। ওদের কাজের কথা ভাবলে, নোংরা ঠেলাটাই সম্ভবতঃ তোমাদের চোখে বড় হয়ে ফুটে ওঠে। কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পার নিতান্ত হেয় এবং হীন এদের কাজ। আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। কাজ সহজ হতে পারে, কিন্তু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। কারণ ঝাড়ুদার-এর ওপর সকলের স্বাস্থ্য নির্ভর করছে। আর জান তো স্বাস্থ্য ছাড়া সমাজ, জাতি, সাম্রাজ্য কোথায় যে তলিয়ে যায়, তার ঠিক ঠিকানা নেই। স্যানিটারী ইন্সপেক্টর এবং ঝাড়ুদারের মাইনের কথা শুনে তোমাদের মন বেঁকে বসল বুঝি! বিশ্বাস না কর, কলকাতার আমেরিকান্ কনসালকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে, কথাটা সত্যি না মিথ্যে। যাক্ সেকথা, যাকে নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল—তার কথাই হারিয়ে গেল। হ্যাঁ, সেই ছেলেটি—যে ছেলেটির আরও ছোটবেলার দুরন্তপনায় পাড়াপড়শী হয়ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ—আমার বন্ধু জেরী।

জেরী সিগারেট, মদ ওসব কিছু খায় না, জুয়া খেলে না, সময় পেলেই ভাল ভাল বই পড়ে এবং সেই সব বই থেকে ভাল ভাল জিনিষ কুড়িয়ে, সহজ সরল ভাষায় গল্প তৈরী কোরে সে তার অন্যান্য ছেলে-বুড়ো বন্ধুদের শোনায়। গল্প বলতে পারে সে ভারি মিষ্টি করে, এতে আনন্দও পায় সে প্রচুর। জেরীর কথা শুনে অবধি অনেক ঝাড়ুদারই বদলে গেছে;

তাঁরা আর মদ খায় না, জুয়া খেলে না। জেরী বয়সে যদিও ছোট, তবু চরিত্রবলে বলীয়ান হয়ে নরকে নন্দনকানন গড়ে তুলেছে, আপনভোলা সেই অন্তরের আত্মীয়তা দিয়ে। অল্প-বয়স জেরীকে এখন অনেকে ভয়ও করে শ্রদ্ধাও করে। অনেক সাদা চামড়াওয়ালা হোমরাচোমরার ছেলেরাও তার কাজে সায় দিয়ে থাকে। সেই কালো কুচ্‌কুচে নিগ্রোটিকে দেখে মনে হতো—কত সুন্দর তার চরিত্র, যার মূলে রয়েছে দেশের সেবার আকুল আগ্রহ। জেরী ব্যারিষ্টার হতে চায় না, লাখপতি ব্যবসাদার বা দোকানী হতে চায় না—সে শুধু চায় নিজের জাতকে নতুন করে গড়ে তুলতে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট লিন্‌কনও ঠিক ঐ রকমটি ছিলেন, একথা হয়ত তোমরাও জানো।

অনেক দিন কেটে গেছে। কিন্তু জেরীর কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। দেশ বিদেশে কত বড় বড় লোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু খুঁজে দেখি জেরীর স্মৃতিটুকুই মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে—তাকেই আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল। সেও কোনদিন আমেরিকার একটা কেউকেটা হয়ে উঠবে হয়ত। বিচিত্র কি! তার মুখের আত্মীয়তায় আমি ভুলি নি—ভুলেছিলাম অন্তরের মাধুর্য্যে। যেদিন তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল, সেদিন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলাম—'ভাই, আসি।' সে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আমার 'ভাই' ডাক—বলেছিল "ভাই না বললেও চলবে, মুখের আত্মীয়তা আমি চাইনা, শুধু মনে রেখো তাহলেই যথেষ্ট।"

কথা বটে অল্প তা হলেও গল্প

বীরত্বের অনেক কথা বোধ হয় শুনেছ। মাঝে মাঝে খবরের কাগজ, মাসিকপত্রে অনেক লোকের অনেক বীরত্বের কথাও পড়েছ। কিন্তু আমি যে মালয় যুবকের কথা বলছি তার বীরত্বের কথা আজ পর্যন্ত কোন পত্রিকাতেই ছাপা হয় নি, ছাপা হবেও না। তাই বলে মনে করো না যে, এটা একটা আমার মনগড়া গল্প? এটা সত্যি! তার প্রমাণ যে গ্রামে মালয় যুবকটির বাড়ী, সেই গ্রামের লোকেরা এখনও তার যথেষ্ট প্রশংসা করে এবং কথা প্রসঙ্গে বড়াই কোরে অন্য গ্রামে গিয়ে তার গল্পও করে। অবিশ্যি গল্প হলেই একটু যোগ একটু বিয়োগ করতে হয়। কিন্তু আমার দ্বারা সেটি সম্ভব নয়। যা দেখেছি তাই বলছি এতে অনেক সময় হয়ত আমার কথা মোটেই তোমাদের ভাল লাগে না। হয়ত মনে হয়, লেখাতো নয় যেন শুকনো ছোহারা, রসকষ এতটুকুও নেই। কিন্তু কি করবো বলো? বাড়িয়ে, ফেনিয়ে, ফাঁপিয়ে গল্প বলার আমি ঘোর বিরোধী। শিশু সাহিত্যে আজকাল এদেশে আজগুবি, মিথ্যে, কাল্পনিক কাহিনীর খুবই চল হয়েছে; এর ফলে দেশের ছেলেগুলিও সব আজগুবি চীজ হয়ে উঠেছে—বাড়িয়ে বলাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের স্বভাবের দোষ। ঐ দেখ, কি বলতে কি সুরু করে দিয়েছি। না, এবার গল্পটাই সুরু করি।

যার কথা বলছি, সেই মালয় যুবকটি যে কোনও দিন লেখাপড়া করেছিল বলে মনে হয় নি। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোল একটা রেল ষ্টেশনে। আমি যাচ্ছিলাম 'মলিম-নেওয়ার' (Malim nawar) বলে একটা জায়গায়। রেলপথের পাশে যে ছোট সরু পথটা থাকে, সেটা ধরেই আমি চলছিলাম। এ রকম পথ ধরে চলা একেইতো ভয়ানক কষ্টকর, তারওপর দুপুরের রোদে তখন মাথার তালু একেবারে চড় চড় করছিল! আমার পায়ে ছিল উলের লম্বা মোজা, তাই পা দুটোও যেন জ্বলছিল গরমে তবুও পথ চলছি আপনভুলে। সঙ্গে চলেছে সেই মালয় যুবকটি, মালয় যুবকের এক হাতে ছিল দুটা ঝুনো নারকেল এবং অন্য হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি। যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাছে কোথাও পরিষ্কার জল পাব বলতে পার? যুবকটি বললে—"আর দু ফারলং গেলে পাবে।" ওদের ভাষায় ঐ কথাটাকে বলে—"কালু পিগি ছুকু বাতু আয়ার বলে ডাম্পাত লা।" যাক্ বুঝলাম জল এখনও বহুত দূর। কাজেই আবার দুজনে একসঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। আমার চিরকালের অভ্যাস কথা বলা, কাজেই কথা বলে যুবক-টির সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে তুললাম। সেও নানা রকম গল্প আরম্ভ করে দিলে। যেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তার পাশেই ছিল জলা আর ডোবা। কাজেই ঐ সব ডোবায় কুমীর লুকিয়ে থাকে। যুবকটি ডোবাগুলো দেখিয়ে আমাকে বললে

সেই সব কুমীরের ভয়ের মেলাই গল্প। ভেবেছিল গল্প শুনে আমি খুব ভয় পাব, কিন্তু সে জানেনা না যে আমি বনের জীবকে কখনও ভয় করি না, অথবা তাদের কথা ভাবিও না। কাজেই একটু বিরক্ত হয়ে বললাম—ওসব ভাবনার বিষয় নয় ওদের কথা যত ভাবা যায়, ততই ওরা কাছে আসে। ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা বলো।

যুবকটি দেখলে বেগতিক, কাজেই সে সুরু করলে—শুনেছেন কি চীনারা আজকাল দিনে ডাকাতি করতে সুরু করেছে? আমি বল্লাম—হ্যাঁ তা শুনেছি, সেই জন্যইত আমি রাতেই পথ চলি। দিনে ত ডাকাতি করে, কিন্তু শুনেছি এরা রাত্রে নাকি ভূতের ভয়ে বাইরে বেরোয় না। মালয় যুবকটি ঘাড় নেড়ে জানালে যে, 'হ্যাঁ তাই।' আমি ভারি খুশী, বললাম—'তাহলে এদেশে রাত্তিরে পথ চলাই ভাল। তাছাড়া দিনের বেলায় রোদের অত্যাচারট্যই কি কম?' যুবকটি আমার কথায় এবারও সায় দিলে। যাক্ আমরা গল্প করতে করতে নিশ্চিন্ত মনে "মালিম নেওয়ার" এর কাছে এসে পোঁছালাম। তারপর একটু দূরে গিয়েই এক মালয় গ্রামে বসে আরাম করে জল খেলাম এবং শেষটায় "মালিম নেওয়ারে" পৌছলাম। আমার সঙ্গে তার কথা হলো যে, বিকালে এসে "পুতে" বলে একজন লোকের কাছে আমায় নিয়ে যাবে। "পুতে" হল আমার আগেকার চেনা পরিচিত এক মালয় ভদ্রলোক।

'মালিম নেওয়ারে' এক আস্তানায় আমি তো সারাটা দিন কাটালাম, তারপর আমাদের কথা মত বিকালে যুবকটি যথাসময়ে হাজির হল আমার কাছে। সঙ্গে তার 'পারাং' বা লম্বা 'দায়ে'র মত একটা অস্ত্র। বুঝলাম যে, মালয় যুবকটি আমার চেয়ে ঢের বেশী হুঁসিয়ার। যাক্, সন্ধ্যাবেলা আমরা তুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা মাঠের পথ ধরে 'লালাং' এক রকমের লম্বা ঘাসের মাঝ দিয়ে চলতে লাগলাম। এখানকার এ ঘাস ৩।৪ ফুট লম্বা হয়, কাজেই আমরা এ'করকম ঘাসে ঢাকা পড়ে গেলামই বলতে পারো।

সেই মেঠো পথ ধরে ঘাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে গ্রাম থেকে বোধ হয় আধ মাইল দূরে এসেছি, নানারকম কথা আর গল্পে যখন মন আমাদের অন্যদিকে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ ৩ জন চীনা ডাকাত সেই 'লালাং' ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে আচম্কা আমাদের আক্রমণ করলে। ৩ জন ডাকাতই চড়াও আমাদের উপর, তাদের হাতের সেই পিস্তলের বাঁট দিয়েই তারা যুবকটিকে আঘাত করবার চেষ্টা করতে লাগল। যুবকটি কিন্তু তাতে একটুও ভয় পেলে না। সে একাই বারেবারে এমন সুন্দর যুযুৎসুর কায়দার সঙ্গে সেই চীনা ডাকাতদের আক্রমণ করতে লাগল যে ঐ তিনটে চীনাই প্রত্যেকবার কিছু কিছু করে পিছু হটতে লাগল। যুবকটি সেই যে একটা 'পারাং' বা বড় লম্বা 'দা' সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সেটা সে আমার হাতে আগেই দিয়েছিল আমার আত্মরক্ষার্থে। কাজেই নিজের

জীবনকে বিপন্ন করে অন্যের হাতে অস্ত্র সঁপে দিয়ে শুধুহাতে সে যে কি করে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করছিল, তাই শুধু আমি ভাবছিলাম অবাক্ হয়ে, কি যে করবো কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না তখন, অথচ পারাং দিয়ে যদি আমি চীনাদের আক্রমণ করতাম, তবে দুএকজনের মরণ নিশ্চিত হোত, কিন্তু তা না কোরে দাঁড়িয়েছিলাম বোকার মত,—শেষকালে কি জানি কি খেয়াল হলো, ডাকাতদের একজনের হাতে 'প্যারাং' এর উল্টো দিকের বাঁট দিয়ে এমন একঘা' বসালাম যে, তার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ল দূরে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখি, সেই পিস্তল ঠিক নয়, ফাঁকা পিস্তল। মনে মনে ভারি হাসলাম, হায়রে ঐ ফাঁকা পিস্তলের ভয়েই আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল! ডাকাতরা ফাঁকা পিস্তল দিয়ে আর কতক্ষণ লড়াই করবে? এদিকে আমি তখন ভরসা পেয়েছি কাজেই আমার হাতের দা বাগিয়ে সাহস করে এগিয়ে গেলাম। এজন্যে যতই বাহাদুরী দাও না কেন আমায়, আমি বলবো আমার এ সাহসের কোন বাহাদুরী নেই, কারণ সেদিনই আমি দেখেছি বীরত্ব কাকে বলে, সাহস মানুষকে কতো শক্তি দেয়, সেদিন যে রকম করে মালয় যুবকটি শুধু হাতে চীনাদের আক্রমণ করছিল সে সাহসের তুলনা হয় না। আর তাছাড়া গোড়াতে তো আমি রীতিমত ভয়ই পেয়েছিলাম, ভয়ের সুযোগ নিয়ে ডাকাতরা হয়ত আমাকে মেরেই ফেলতো, যদি না মালয় যুবকটি থাকতো আমার সঙ্গে। তিনজন চীনাই

প্রায় ১০ মিনিট ধরে আমাদের সঙ্গে হাতাহাতি কোরে শেষটা লম্বা ছুট দিলে ঘাসের ভেতর গা ঢাকা দিতে।

ঘটনাটা ঘটলো যেদিন সন্ধ্যেবেলা, তার পরের দিনই সহরে গিয়ে শুনলাম গল্পটা, সেটা তখন খুবই রোমাঞ্চকর আকার ধারণ করেছে। লোকে বলাবলি করছে আমাদেরই কথা, আমাদের নাকি আক্রমণ করেছিল ২৫জন চীনা এবং আমার কাছে যে পিস্তল ছিল, তার গুলিতে অনেকেই নাকি ঘায়েল হয়ে পালিয়েছে। কারুর কারুর টিকি উড়ে টাক হয়ে গেছে ইত্যাদি, অর্থাৎ মিথ্যের জয়ঢাক বাজছে; এটাকেই বলে আজগুবি গল্প। আমি এ রকম গল্পের পক্ষপাতী নই। রাগে গা জ্বলে গেল। কাজেই যা যা ঘটেছিল, তাই সকলকে ডেকে বললাম, শুনে তারা ভারি মনক্ষুণ্ণ হোল। গল্প-বলিয়ে দলের মুখটি হলো চূণ। সব জিনিষ বাড়িয়ে বলাটা যেন বর্ত্তমান সভ্য সমাজের একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—মিথ্যের ভিত্তিতে সবকিছুই গড়বার চেষ্টা চলছে! কিন্তু হায়! মিথ্যে যে ভাই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না, ওর কোনও স্থায়িত্ব নেই। তাইত তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাবটি ছাড়ো, আর বাড়িয়ে যারা কথা ব'লে বা বীরত্বের বড়াই ক'রে তোমাদের ভোলাতে চায়, তাদের কথা একটুও বিশ্বাস কোরো না। ওতে মন দুর্ব্বল হবে, জাত দুর্ব্বল হবে, বুঝলে?

ধর্মের নীতি না মানুষের প্রীতি ?

মিঃ ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ফ্রিস্কো সহরে এসেছিলাম। ফ্রিস্কোর অপর নাম স্যান্‌ফ্রানসিসকো, সে কথা আগেই বলেছি। মিঃ ঘোষ আমাকে Clay এবং Keary streetএর মোড়ে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, "আপনার ব্যবস্থা করে নিন"—এ কথা বলার তাৎপর্য হলো, তাঁর যেমন শরীরের রংটি কালো কুচকুচে, আমারও তেমনি। বিদ্যে-বুদ্ধি, দেশের ধন-দৌলত এ সব আমেরিকায় চলে না। আমেরিকায় চলে শরীরের রং। কাজেই মিঃ ঘোষ সেটা আমাকে রসিকতা করে বুঝিয়ে দিলেন! ওটা অবিশ্যি আমার আগেই জানা ছিল, অমিওতো তাই নিজের সত্য পরিচয়টা চট্‌ করে দিতে চাইতাম না। যদি কেউ গায়ে পড়ে এসে জিজ্ঞাসা করত, তবে বলতাম আমি 'হিন্দু'। অনেকের তাক্‌ লেগে যেত, হিন্দু এত কালো হয় কি করে ? ফ্রিস্কোতে এসেও নিজের জাতির পরিচয় না দিয়ে হোটেল খুঁজতে লাগলাম। তিনটি হোটেল থেকে ফিরে এসেছি বিফল হয়ে। মনে মনে ভাবছিলাম হয়ত এ অঞ্চলেও কোনও হোটেলে ঠাঁই পাওয়া যাবে না। পথে দেখা হলো একটি যুবকের সঙ্গে তার বয়স এই আন্দাজ ছাব্বিশ হবে, মুখে এরই মধ্যে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে, কিন্তু চোখ দুটো তার আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ অঞ্চলে আমার

মত কালো লোকের স্থান পাবার মত হোটেল আছে কি? সে বল্লে, "চলুন নিয়ে যাচ্ছি।"

দুটো ব্লক পার হয়েই আমরা ইণ্টার ন্যাশানাল হোটেলে এসে হাজির হলাম। হোটেলের ম্যানেজার ও মালিক এক ফরাসী ভদ্রলোক, দেখলাম তারা রং এর বালাই নিয়ে মরে না। যাওয়া মাত্রই আস্তানার ব্যবস্থা হলো, আমাকে একটা জমকালো ঘর দেওয়া হলো। আমি ঘরটাতে বেশ ভাল করে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে স্নানপর্ব্ব সেরে দিব্যি আরাম করে বসলাম। যুবকটি বসেইছিল এতক্ষণ, সে আমার আরাম আর শরীরের তোয়াজের ব্যবস্থা দেখে খুশী হলো, তাই সে নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার আমার বিছানার এক পাশে বসল। ভাব জমাবার মতলবে আমাকে অনেক খবর জিগ্যেস করলে। তারপর তার অতীত জীবনের কথা আমাকে ব'লে সেদিনকার মত বিদায় নিলে। যুবকের নাম 'জন হার্টস্', সে যে সব গল্প বলেছিল সেদিন, এবার তাই বলব আমার ডায়েরী থেকে।

বছর কয়েক আগে এই সহরেই একটা Y. M. C. A এর বাড়ীর সামনে সে বসেছিল। জন ভেবেছিল কেউ দয়া করে একটি কোয়ার্টার (২৫ সেণ্ট) দেবে, এবং তাই দিয়ে সে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর বিছানা ভাড়া করবে। কেউ তাকে দয়া করে নি। সেদিন কতলোক এলো, কতলোক গেলো, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকালো না। রাত তখন তৃতীয় প্রহর, জন সেই ইমারতের ঠাণ্ডা বারান্দায় বসে বসে পথের

ওপারের কুকুরের চীৎকার শুনছিল। অনেক পোষা কুকুরও মনিবের কাছ থেকে যোল আনা শিক্ষা না পেয়ে অনভ্যাস বশতঃ মঝে মাঝে হোটেলের কামরাগুলো থেকে উঠছিল চীৎকার করে। কুকুরের মনিব তা সহ্য করতে না পেরে সপাসপ্ চাবুক বসিয়ে দিচ্ছিলেন তাদের পিঠে। সেই শব্দে আর কুকুরগুলোর সেই করুণ আর্ত্তনাদও তার কানে ভেসে আসছিল, তবুও তার মনে হলো, যদি সে পোষা কুকুরও হতো, তবে শীতে তাকে আজ এমনিধারা কাবু করতে পারতো না। চাবুক খেয়েও আরামে থাকতে পারতো হোটেলের কামরায়। রাতটা অমনি বসে বসে কাটিয়ে সকালবেলা সে একটা পার্কে গিয়ে বসল, হালকা রোদে যখন মাঠ ঢেকে গেল, তখন সে শুয়ে পড়ল মাঠে, ঘুমিয়ে পড়ল সেইখানেই।—এইবেলা তার আর কিছু পরিচয় শুনে রাখ তোমরা।

জন যেমন ভদ্র, তেমনি ধর্ম্মভীরু, তার কাছে থাকত সদাসর্ব্বদাই বাইবেল আর আব্রাহাম লিংকনের জীবনী, যখনই তার কোন দুঃখ কষ্ট হতো তখনই সে বাইবেল বার করে পড়তো, আর পড়তো লিংকনের কষ্টের জীবনী। এ সব ছাড়া তার আরও অনেক গুণ ছিল। সে কখনও কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে চুপ করে বসে থাকত না! যখনই কোন চাকরী বা কাজ করে পয়সা রোজগার করত, তখনই তার ধার-দেনা কড়ায় গণ্ডায় শুধে ফেলত। কিন্তু এমনই তার বরাত যে, সে এক জায়গায় অনেকদিন চাকরী করতে

পারত না। কি জন্য যে সে এক জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকতে পারত না, সে নিজে তা ভাল করেই জানত। তবে কারো কাছে সে সব কথা প্রকাশ করত না। শুধু বলতো— তার পোষায় না, তাই সে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে।

জনের এক ছোটবেলার বন্ধু ছিল। তার নাম 'পল'। বাল্যবন্ধুকে আমেরিকান্ ভাষায় 'প্যাল' বলা হয়। কাজেই জন কখনই তাকে পল বলতো না। সব সময়েই বলতো 'প্যাল'। দুজনেই যখন যৌবনে পা দিলে, বড় হলো, পল তার নিজের পছন্দসই রাস্তা বেছে নিলে। জনের মত সে ধর্ম্মভীরু নয়। পাপ-পুণ্যকে সে চেনে না, চেনে পয়সা। যাক্ জন মাঝে মাঝে গিয়ে তার 'প্যালকে' পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য গালাগাল দিয়ে আসতো। পল তাতে মোটেই রাগ করত না, বরং হাতে যদি কিছু বাড়তি টাকা পয়সা থাকতো তবে তা দিয়ে তার ছোটবেলার সেই সৎ বন্ধু 'জন'কে সাহায্য করতে। Y. M. C. Aএর বারান্দার সামনে যেদিন জন বসেছিল, সেদিনও জনের সঙ্গে পলের দেখা হয়েছিল। কিন্তু পল জনকে হাত তুলে কিছু দেয় নি, উপরন্তু এমন একটা কথা বলে, যাতে জনের মনে বেশ আঘাত লাগে। তাই জন সেদিন সবচেয়ে নিরাশ হলো, ভাবলো এরকম করে উপবাস করে আর কি হবে!—এর চেয়ে মরাই ভাল। তাই সে আর পার্ক থেকে উঠল না—মনের দুঃখে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এই মতলবে পার্কেই রইল শুয়ে।

আমেরিকায় নিয়ম আছে পার্কে রাতের বেলা কাউকে

থাকতে দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু জনের দুরবস্থা দেখে পুলিশও দয়াপরবশ হয়ে সেদিন তার ঘুম ভাঙ্গায় নি।

এই রকম করে অনাহারে আধমরা আর উপবাসে জনের আরও দিন দুই কেটে গেল, সেদিন পল আবার সেই পার্কের পথ ধরেই চলছিল তার কাজে, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়লো জন যেন আধমরা হয় পড়ে আছে—পল জনকে নেড়েচেড়ে যখন দেখলে যে আর দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই জন মারা যাবে, তখনইসে ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে জনকে নিয়ে চললো এক হিন্দুর হোটেলে সেখানে এক ডায়েম অর্থাৎ ১০ সেণ্ট দিলেই এক রাত্তির বাস করা যায়। সবচেয়ে সস্তা ব্যবস্থা।

হোটেলে নিয়ে জনকে বিছানায় শুইয়ে দিলে, তার মুখে বেশ করে জলের ঝাপটা দিয়ে পল তাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলে। ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জন যখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো তখন তাকে দেওয়া হলো পথ্য ও দুধ। উপবাসের পর পেটে ভার পড়াতে জন আবার ঘুমিয়ে পড়লো। জনের যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দেখলো মিঃ গিডনী তারই কাছে বসে আছেন। মিঃ গিডনীকে দেখেই জন শিউরে উঠল, এমন ভয় পেল যে খালি হাতে জঙ্গলে Royal Bengal Tiger দেখলেও মানুষ তেমন ভয় পায় না। ভয় পাবার কারণও আছে যথেষ্ট। লোকটি রবিনহুডের মতই বড়লোকদের টাকাকড়ি নিয়ে গরীব মজুরদের সাহায্য করে; কিন্তু জন গোড়ার কথাটাই জানে শুধু, শেষের কথাটা জানে না।

—“আমাকে ভয় পাবার কারণ কি জন” ?

—“আপনি বিপথে চলেন আমার জানা আছে, তাই ভয় করে, ভগবান আপনার পাপের শাস্তি দেবেন নিশ্চয়ই” ।

—“সত্যি কথা ! আমি পাপ করি, কিন্তু সেটা পাপ কি পুণ্য, সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছ কি ? শুধু লিংকনের জীবনী পড়েই তো জীবন কাটালে, অন্য কোনও বই পড়েছে কি ?”

—“অন্য বই পড়তে আমার ভয় হয়, পাছে বিপথে গিয়ে পড়ি, অন্যায় করে বসি তাই ।”

—“এটা তোমার ভুল—সময়ের পরিবর্ত্তন হচ্ছে, যুগের হাওয়া বদলাচ্ছে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হাল চাল বদলাতে হচ্ছে । একেই তুমি পাপ বলছ ? যদি পাপী হতাম তবে তোমাকে বাঁচবার জন্য এত পয়সা খরচ করতাম না । ঐ পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতাম, জুয়া খেলতাম, জন । একটু ভেবে দেখা উচিত, পাপ কাকে বলে ।”

—“হাঁ, তাইত । শুধু শিখেছি পাপ বলে একটা কথার কথা । এখন দেখবো সত্যিই পাপ কাকে বলে, কি করে জানবো, পাপ কাকে বলে ?”

—“এ সব ভাববার বিষয় জন, শরীরে শক্তি হোক, ভাল হয়ে ওঠো, তারপর কথা হবে, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ কি, যে তোমার চাকরী থাকে না কেন ? কোনও ‘পাপ’ করেছো ? কোন্ পাপে ধনীর দল তোমাকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দেয় ? ষোল আনা খাটিয়ে নিয়ে ষোল আনা পয়সা দেয় না ?”

জন তখন বুঝতে পারলে গিড্‌নীর কথার মানে, বুঝলে গিড্‌নীকে কত ভুল বুঝেছে সে। সে বিছানায় ঢুলে পড়ল, অজ্ঞান হলো সাময়িক উত্তেজনায়, যখন জ্ঞান হলো গিডনী তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, না খেতে পেয়ে তোমার শরীর এতো দুর্ব্বল হয়েছে যে একটু ভাবলেই অজ্ঞান হয়ে যাও। যারা তোমাকে দুর্ব্বল করেছে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে তারাই পাপী। জন! পাপী আমি নই। আমি চেষ্টা করেছি যাতে তোমরা বাঁচো, তোমরা খেতে পাও। বাইবেল মুখে দিয়ে আকুল হয়ে ভগবানকে ডেকে বললেই হবে না—'রক্ষা করো, রক্ষা করো,—প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে অন্ন জোটে, মাথা রাখবার ঠাঁই পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করতে হবে, সে অধিকার কেড়ে নিতে হবে, তাকেই বলে পুরুষত্ব। শুধু 'পাপ', 'পাপ' বলে চীৎকার করলে চলবে না, পৃথিবীতে যারা অহরহঃ পাপ করছে, তাদের শাস্তি দেবার মত শক্তি আর সাহস যোগাড় করতে হবে। সত্যিকারের পুণ্যসঞ্চয় তাতেই হবে। ধর্ম্মের বুলি আউড়ে নিজে না খেয়ে মরবে, চোখের সামনে অপরকে মরতে দেখবে—এটা কোন ধরণের পুণ্য বলতো?" জন বুঝলে তার ভুল সে দিনই—সে দিন থেকেই সে তার মত বদলে নতুন মানুষ হয়ে উঠলো।

যে লোকটি লিংকনের জীবনী আর বাইবেল হাতে করে পথে পথে ঘুরে বেড়াত আধপেটা খেয়ে, আধবেলা ঘুমিয়ে—নিজের খাবার যোগাড় করবার ক্ষমতা ছিল না যার, আজ সেই

'জন' লোকটিই স্যানফ্রানসিসকোর C. I. Oএর একটা কেউ কেটা ; তারই চেষ্টায় আজ অনেক লোক বেকার হয়েও খেয়ে দেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে। কারণ জন আমেরিকার সরকারের সঙ্গে লড়ে Social Security বলে একটি সুন্দর প্রথার প্রবর্ত্তন করেছে। অথচ 'জন' এখনও থাকে এক কানা গলিতে, ওঁছা এক বাড়ীতে। এখনো তার ইচ্ছা করে না বড় লোকদের সঙ্গে মিশতে—বড় মানুষী করতে। যে জন ছিল একমাত্র পলেরই 'প্যাল'—আজ সে ক্যালিফর্ণিয়ার সব মজুরদের বন্ধু, সবাই তাকে আদর করে ডাকে 'প্যাল' বলে। বাইবেল সে পড়ে ; তবে বাইবেলের সেই এক গালে চড় খেয়ে অপর গাল পেতে দেবার নীতিকে সে বর্ত্তমানের উপযোগী বলে মনে করে না ; ধর্ম্মের নীতির চেয়ে মানুষের সেবায় যে 'প্রীতি' পাওয়া যায়, তাকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় বলে মনে করে! এই গল্পই বলেছিলো সে সেদিন আমাকে, ভারি ভাল লেগেছিলো তার এই সত্যি গল্পটি, আজ আমি সেটাই তোমাদের আবার বললাম। ভাল লাগলো কি ?

মাথার ওপর ঝুলছে তোদের খাঁড়া
এখন থেকে শক্ত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়া

যুগোশ্লোভিয়াতে থাকার সময় সেড (Sed) বলে একটা জায়গায় পোঁছে একটি ইহুদী হোটেলে গিয়ে থাকবার ইচ্ছা জানালাম। হোটেলের মালিক তো আমাকে তখনই আধা দামে থাকবার অনুমতি দিয়ে দিলেন, তারপর নানা কথাবার্ত্তা হবার পর, কথায় কথায় বল্লেন—এখানে একজন ইণ্ডিয়ান আছেন। কথাটা শুনে আনন্দ হবার কথাই তো—বিদেশে গিয়ে ভারতীয়দের পেলে ভারি আনন্দ হয়। সে দিনই বিকালে ইণ্ডিয়ানের বাড়ীর খোঁজে খবর নিয়ে সেখানে হাজির হলাম। কিন্তু কাউকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু আমি তো সহজে দমি না, তাই বসেই রইলাম। যাক আধ-ঘণ্টার মধ্যেই একটি বছর বারো বয়সের ফুটফুটে ছেলে ঘরে ঢুকেই আমাকে ইংরাজীতে বল্লে, "কাকা, কেমন আছেন? অবাক হলাম। কিন্তু ছেলেটির ইংরেজীর কথাগুলো কেমন অস্পষ্ট আর আড়ষ্ট, তাছাড়া ছেলেটির চোখে মুখে একটা যেন চাঞ্চল্য আর ভয়ের ভাব—দেখে মনে হলো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। যাক পরে সব কথাই জানাই গেল ছেলেটির কাছ থেকে। জানলাম, ছেলেটির বাবা আমার মতই এক কালা আদমী, তবে লোকটি ভারতীয়

নয়, আসলে তাঁর বাড়ী সিংহলে। আগে তিনি একজন জার্মান লেডীকে বিয়ে করেছিলেন এবং এই ছেলেটি সেই জার্মান স্ত্রীরই ছেলে। ছেলেটির জার্মান-মা মারা গেছে। তার মা মারা যাওয়ার পর সিংহলী ভদ্রলোক আবার নতুন করে যুগোশ্লাভিয়ার একটি শ্লাভ মেয়েকে বিয়ে করেছেন। কাজেই ছেলেটির এই অস্বস্তি, আগে ইংরেজী আর জার্মান ভাষা তাদের ঘরের ভাষা ছিল, বর্ত্তমানে হয়েছে শ্লাভ ভাষা। ছেলেটি সেইজন্যেই ইংরেজী কথা অত আস্তে বলছিল, পাছে তার সৎমা শুনে ফেলে। তার সৎমা তাকে ইংরাজীতে কথা কইতে শুনলে ভারি নাকি চটে যায়।

তাকে বল্লাম, "এতে ভয় করার কি আছে ?" ছেলেটি বললে—"নিশ্চয়ই ভয় করার আছে, কারণ আমাকে তো শরীরটি ঠিক করে গড়ে নিতে হবে, সাবালক হবার আগেই।" কথাটি ঠিক বুঝলাম না তো—ছেলেটি তখন বললে, বাবা তো ঘরে থাকেন না, কি খাই না খাই জানেনও না। সৎমাই এসব দেখাশুনো করেন কাজেই যদি তিনি রেগে যান, তবে না খেতে পেয়েই আমার শরীরটি ভেঙে যাবে, বাবাকে বল্লেও তো কিছু শুনবেন না! কাজেই ভবিষ্যতের ভাবনা তো ভাবতে হবে কাকা! জানেন না, "Health is wealth" ? আমাকে যেমন করেই হোক শরীরটি গড়ে নিতেই হবে, তবে তো ভবিষ্যতে কাজ কর্ম্ম করে খেটে খেতে পারব,—পারব, নিজের পায়ে দাঁড়াতে।" ছেলেটি তার নূতন মায়ের বিরুদ্ধে আরও

অনেক কিছু বললে, আমিও দেশবিদেশের ভ্রমণ কাহিনী বলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম, এমন সময় তার বাবা ফিরে এলেন, ছেলেটি ছুটে গিয়ে তার বাবাকে আমার আসার খবরটা দিয়ে দিলে। খবর পেয়ে তার বাবাও আমার কাছে এসে আদর অভ্যর্থনা জানালেন ছেলেটি তখন যেন প্রাণ পেল, চোখে মুখে কত আনন্দ! ছেলেটির বাবার সঙ্গে খুব আলাপ জমল! এমন সময় দেখি কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড মুরগী বগলদাবায় নিয়ে হাজির সেই ছেলেটি। বল্লে, Daddy should I kill this to entertain our uncle? অর্থাৎ এটা মেরেই আজকে কাকাকে খাওয়াবো কি? সিংহলী ভদ্রলোক কি ক'রে আর বারণ করেন বলো? তাই বোধ হয় ছেলেটিকে বড় মুরগীটাকেই কাটতে আদেশ দিয়ে ফেললেন, কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখটি যেন শুকিয়ে উঠলো, আশঙ্কা হলো বাড়ীর কর্ত্রী যদি বাড়ী ফিরে রাগারাগি করেন। আমি এ ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেছিলাম যে, তাতে আর সন্দেহ নেই। যাক খানিক গল্পের পরে ভদ্র-লোকের শ্লাভ-গৃহিণী এসে হাজির হলেন। তাদের স্বামীস্ত্রীর কথাবার্ত্তা হলো আমাকে নিয়ে, বুঝলাম যে সিংহলী ভদ্রলোকটি শ্লাভ ভাষা বলতে পারেন, তবে মহিলাটি ইংরেজী ভাষা বলতে পারে না। মুরগীবধ পর্ব্বটা বেশ নীরবেই হয়ে গেছে যে তাও বুঝলাম, তারপরেই খাবার ডাক পড়ল।

খাবার সময় যদিও আমরা হিন্দীই বলছিলাম, তবুও ঐ শ্লাভ মহিলাটি ভাবছিলেন যে, আমরা ইংরেজীতেই কথা

বলছি। শেষটায় ছেলেটিকে লক্ষ্য করে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন,—"এরা কোন্ ভাষায় কথা বলছে? আর কি বলছে? ছেলেটি শ্লাভ ভাষায় জবাব দিলে,—"দূব্রে পিতার বি্ভ্ষনা" মানে "ওরা ভাল কথাই বলছে এবং ওদের পিতৃ ভাষাতেই কথা বলছে বলে মনে হয়।" স্ত্রীলোকটির তখনকার মত মন একটু শান্ত হলো বটে, কিন্তু যেভাবে মুরগীর মাংস ভরা প্লেটের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তাতে মনে হলো আমি চলে গেলে একটা কাণ্ড বাধবে। যাক পরমানন্দে ভোজন পর্ব শেষ করে তাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় চাইলাম।

বিদায়ের বেলা ছেলেটি আমাকে বলেছিল, "কাকা তুমি শুধু আমার হয়ে এইটুকু প্রার্থনা করো যে, আমি যেন খুব শিগ্গিরী শরীরটাকে বেশ করে গড়ে নিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারি। শরীর ভাল থাকলেই আমার হবে, আমি খেটে খেতে পারব।" ছেলেটির সে কথাগুলি আজ এদেশে ফিরে বেশী করে মনে পড়ে; কারণ এদেশে বহু স্কুল কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়েছি বক্তৃতা দিতে—সেখানে খাতির, অভ্যর্থনা যা পেয়েছি, তার মধ্যে এমন আন্তরিকতাপূর্ণ কোন অনুরোধ পাই নি, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বা সুস্থ সবল দেহ গড়ার জন্যে কোনও কৌতূহলী প্রশ্ন পাই নি আমি। ভাবতো দেখি তোমরা সেই ছেলেটির কথা—একদিকে সৎমায়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অন্যদিকে তার ভবিষ্যৎ গড়ে নেওয়ার কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা—সে মান অভিমান ভুলে কোনও তিরস্কারই গায়ে মাখে না, সব সে সয় মুখ বুজে—ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে।

তোমরাও কি পার না অমনি করে নিজের নিজের শরীরটীর যত্ন নিতে ? চেষ্টা কর কি চট্‌পট্‌ বড় হয়ে উঠে সুস্থ সবল দেহ গড়ে নিয়ে বাপমায়ের বোঝার লাঘব করতে ? এখন থেকে ভাবতে শেখ নিজেরাই নিজেদের শক্ত করে গড়ব পরিশ্রম করে খেটে নিজে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াব ।

বিপদে যে ধীর—সেই তো রে বীর

চীনদেশের একটি দিন—আকাশ অপরিষ্কার। কখনও বা বৃষ্টি পড়ছে, কখন বা জলকণা জমাট বেঁধে আকাশ থেকে তুষার হয়ে ঝরছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে পবন আর বরুণ দেবতা দুজনে মিলে চীনদেশের মাটিকে সেদিন ভিজিয়ে দিচ্ছিল। শুধু তাই নয়। উপর থেকে জাপানী বোমারু এরোপ্লেন বোমা ফেলে সাংহাই সহরের চাপাই অঞ্চলে অধিকাংশ ঘরগুলিকেই মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। সেখানের লোক জন কোথায় যে পালিয়ে ছিল তা কেউ বলতে পারে না, শুধু সবাই জানে চাপাই অঞ্চলে লোকজন বড়কেউ নেই, কিন্তু যাদের যাবার উপায় নেই তারা ছিল। এমনই যখন সেখানকার অবস্থা তখনই আমি ঐ চাপাই অঞ্চলে উপস্থিত ছিলাম। এটাই হলো গল্পের ভূমিকা—এখন আসল গল্পই স্থুরু করা যাক।

আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি। দেখলাম চীনদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ অঞ্চলের পথে পথে ঘুরছিল, আর ভিক্ষা করছিল। তাদের দেখে আমার মত ভবঘুরেরও কষ্ট হলো, তাই আমার কাছে যা দু'চার পয়সা ছিল তারই কিছুটা ওদের দিয়ে চাপাই অঞ্চলের মাঝামাঝি একটা যায়গায় হাজির হলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম যুদ্ধের ধ্বংসলীলা। এ ধ্বংসলীলার দৃশ্য আজ পৃথিবীর অনেক বড় বড় সহরে গেলেই

দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তখনকার দিনে সে দৃশ্যের অবতারণা শুধু চীনদেশেই হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে চাপাই অঞ্চলের এইসব দৃশ্য দেখার পর 'ছিচিওয়ান রোড' ধরে ইন্‌টার ন্যাশনাল সেটেলমেণ্টের দিকে ফেরবার পথ ধরলাম।

পথে একটি ছেলের সঙ্গে হলো দেখা। ছেলেটির বয়স বার তেরো বছর হবে। পরণে তার সিল্কের পায়জামা আর কোট, পায়ে দামী জুতো, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, সেটি দেখলাম বিলাতী। চেহারাটা রুক্ষ, মুখখানা শুকিয়ে গেছে তবুও দেখলেই মনে হয় এই ছেলে গরীবের ঘরে জন্মায়নি। কেমন জানি মায়াও হলো। ছেলেটির পিছু নিলাম—অনেকক্ষণ চলার পর হাংকিউ পার্কের কাছে এসে ছেলেটি দাঁড়াল, এবং পিছন ফিরে তাকিয়ে জলভরা চোখে চাপাই-এর বিধ্বস্ত ঘরবাড়ীগুলো একবার দেখে নিলে। ছেলেটিকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলাম "এমন করে চলছ কেন খোকা—তোমার মা বাবা কোথায়?" ছেলেটি একটি দীর্ঘ নিশ্বঃস ছেড়ে ইংরাজীতেই জবাব দিলে—"মা বাবা ভাইবোন আর নেই।" বুঝলাম হয় ত ওর মা বাবা গুলীর আঘাতে মরেছে, নয়তো ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে জীবন্ত কবর হয়েচে। কিন্তু এই বাপমা-মরা অসহায় ছেলেটির কি গতি হবে তাই ভেবে আমিও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন যাবে কোথায় ঠিক করেছ?" ছেলেটি বললে, সে যাবে একটা কিশোর-কল্যাণ সদনে। আমি বললাম 'হেঁটে যেতে তোমার কষ্ট হবে—চলো রিক্সা করে আমি সেখানে

পৌঁছে দিই—ছেলেটি রাজি হলো। রিক্সাতে তাকে বসিয়ে চল্লাম সেই অজানা পথে। ছেলেটি চীনা ভাষায় রিক্সাওয়ালাকে কি বললে আর রিক্সাওয়ালাও রিক্সা হাঁকিয়ে চল্ল 'ফ্রেঞ্চ কন-সেসনের' দিকে।

অনেকক্ষণ যাবার পর আমরা একটি বড় পথের পাশে নামলাম। আমি ভেবেছিলাম কোনও বাড়ীর সামনে রিক্সা থামবে। কিন্তু তা নয় রিক্সা এসে থামল একটি রাস্তার মাঝখানে। রাস্তাটা খানিকটা দূর গিয়েই শেষ হয়েছে একটা দেওয়ালের সামনে। দুদিকে বাড়ী, তার পরে দেওয়াল। দেওয়ালের কাছে কতকগুলি চীনা ছেলেমেয়ে মাটিতে বসেছিল এবং পথের দিকে চেয়ে আকুল আগ্রহে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল। আমার সঙ্গের ছেলেটি তাদের কাছে গিয়ে বিজ্ঞের মত চীনা কায়দায় অভিবাদন জানালে, অন্যান্য ছেলেরাও তাকে পাল্টা অভিবাদন করলে। তারপর সে গিয়ে বসল তাদের কাছে। তার সিল্কের পাজামা গায়ের সুন্দর কোট আগেই ধূলো কাদায় ময়লা হয়েছিল, কাজেই তার কোন ভাবনা না রেখেই ছেলেটি সেখানে বসে পড়ল। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই কি তোমাদের 'কিশোর কল্যাণ'- সদন?" ছেলেটি বললে, "মনে হচ্চেতো এইটাই, তবে আপনি একটু দাঁড়ান, দেখি এরা কি বলে, যদি এরা আমাকে সাথী করে নেয়, তবেই আপনার ছুটি।"

একটু দাঁড়াবার পরই অন্য একটি ছেলে এসে হাজির। তার

বয়সও ঠিক ঐ ছেলেটির মতই। তখন সুরু হলো এদের দুজনের আলাপ। মনে হলো এই ছেলেটিই 'কিশোর কল্যাণ-সদনের কর্ত্তা'। ইচ্ছা হলো ওর সঙ্গেও একটু কথা বলি, কিন্তু এদের দেখে কিছুই মুখ থেকে বেরুলো না। ওদের আলাপ শেষ হবার পর ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এই তোমাদের কিশোর কল্যাণ-সদন নাকি ?" নবাগত ছেলেটি তার জবাবে বল্লে, "আজ্ঞে না এটা হলো আমাদের অফিস। আসুন আপনাকে আমাদের কিশোর-সদন দেখাব।" আমি ওদের সঙ্গে একটা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। এটাকে ঠিক বাড়ী বলা চলে না একটা ছোট ঘুপ্‌সী ঘর মাত্র। ঘরখানি দশ বার হাত লম্বা এবং চওড়াতে তার চেয়েও কম। এরই ভিতরে দেখি কুকুর ছানারা যেমন করে একটির উপর অন্যটি গাদাগাদি করে শুয়ে থাকে তেমন করে কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে সেখানে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। এমন কি, আমাদের আসা যাওয়ার গোলমাল ও শব্দে ওদের একটুও ঘুম ভাঙল না। এ ব্যবস্থা দেখেই বাইরে চলে এলাম। শিশু-সদনের সেই সর্দ্দার ছেলেটি, আর আমার সঙ্গে হাংকিউ পার্ক থেকে যে ছেলেটি এসেছিল তাদের অনেক কথাবার্ত্তা হলো, তারপর দুজনে মিলেই আমার সঙ্গে নানাকথা সুরু করলে !

সর্দ্দার ছেলেটি বললে, 'চাপাইয়ে বোমা পড়ার পর সে অঞ্চলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের দেখবার কেউ নেই। তাদের মধ্যে যারা একটু বয়সে বড় আমি তাদেরই

একজন। আমরা তাই নিজেরাই এই কিশোরসদন খুলেছি, আর যেখানে যত অনাথ ছেলেমেয়ে দেখছি তাদের এখানেই আনছি—তবে উপযুক্ত খাবার দাবারের কোন সংস্থান করতে পারিনে এখনও। কিন্তু প্রত্যেকটি ছেলেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, পথে কুড়িয়ে অথবা ভিক্ষা করে যে যা পাবে তা থেকে অন্য সবাইকে ভাগ না দিয়ে খেতে পারবে না। ঐ যে দেখছেন বাইরে ছেলের দল বসে আছে, ওদের ঘরে জায়গা হলো না বলেই বাইরে বসে আছে। যখনই সময় হবে তখন অন্য ছেলেদের ঘুম থেকে উঠিয়ে বাইরে বার করে দিয়ে ওদের ঘরে নেওয়া হবে, তখন ওরা আবার ঘুমিয়ে নেবে। ছেলেটির কথা শুনে আমি অবাক—যে জাতের ছোট ছেলেমেয়েরা এমন—তাদের জয় করা কি সহজসাধ্য ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওদের কারুরই খাওয়া হয় নি। কারণ ওই ছেলেগুলির প্রত্যেককে শুধু যদি এক পেয়ালা ভাত খাওয়াতে হয়, তবে খরচ হবে তিন ডলার। আমি তখনই তিন ডলার দিতে চাইলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল, সে আমার হাত চেপে ধরে তার পকেট থেকে তিনটি ডলার বার করে দিলে।

'খাবারের জন্য টাকা পাওয়া গেছে' এ সংবাদটি তখনই সবাইকে জানিয়ে দিলে সর্দ্দার ছেলেটি, কিন্তু লক্ষ্য করলাম এ খবরে কোনও ছেলেই ব্যস্ত হয়ে অথবা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গোল-মালের সৃষ্টি করলে না। তারা দল বেঁধে সর্দ্দার ছেলেটির

পেছুপেছু চললো একটি রেঁস্তোরার খোঁজে। আমিও চল্লাম তাদের সঙ্গে। বহু দূর হেঁটে এক দোকানে হাজির হলাম। দোকানী ওদের প্রত্যেককে এক পেয়ালা ভাত আর একটু নুন দিলে মাত্র। তাই খেয়েই ওরা সবাই সন্তুষ্ট হলো, অত শোক বিপদেও সবাইয়ের মুখে হাসি ফুটলো! ভয় ডরের কোন চিহ্ন সেখানে নেই দেখে আমি অবাক! আমার সঙ্গের ছেলেটিকে জিগ্যেস করলাম, তুমি কি ওদের সঙ্গেই থাকবে?" হাসিমুখে জবাব দিলে, হাঁ আর কোথায় যাব, এদেরও যে গতি আমারও সেই গতি।

আজ সেই কথাই মনে পড়ে গেল—কারণ এদেশে বোমা পড়ার গুজবে বড়োরাই ঘাবড়ে গেছে, অথচ সেখানে সজ্ঘবদ্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই, ছন্নছাড়া হয়ে যে যেখানে পারছে সরে পড়ছে—তোমরাও কি করছ জানি না—তবে তোমাদের উপর আমার এটুকু আস্থা আছে যে 'আনন্দ-মেলার' ভিতর দিয়ে অন্তত নিয়ম মেনে চলা' ও সাহসের শিক্ষাটুকু তোমরা এতদিনে পেয়েছো।

এর নাম প্রায়শ্চিত্ত

আফগানিস্থানের 'হিরাত' সহরে যখন গেলাম তখন দেখলাম সেখানে বড় বড় পথ খোলা হয়েছে। নূতন ধরণের দোকানপাটও বসেছে, শুনলাম বড় বড় সহরের মত সেখানে স্নানাগার, হোটেল, রেঁস্তোরা তৈরী হবে ঠিক হয়েছে, কিন্তু তখনও পুরোদলে সুরু হয়নি—কারণ তখন সেখানে ভয়ানক শীত। শীতের কুয়াশায় ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে দেখতাম কখন আকাশ পরিষ্কার হবে।

হিরাতে আমি একজন হিন্দুর বাড়ীতে থাকতুম। ক্রমশঃ হিরাতের একজন বাঙ্গালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। তিনি এসে মাঝে মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতেন এবং হিরাতের নানা কথা আর গল্প শোনাতেন। ইচ্ছেটা তাঁর আমাকে 'হিরাতে'ই আটকে রাখা, কিন্তু আমার মন তখন চঞ্চল। আমি ভাবতাম রাশিয়ায় যাই কি পারশ্যে যাই? রাশিয়ায় যাবার ইচ্ছাটাই তখন প্রবল কিন্তু আমি জানিতাম যে যদি রাশিয়ায় যাই, তবে আর পৃথিবী ভ্রমণ আমার হবে না। কাজেই যে প্রকাণ্ড বড় পথটা হিরাতের দিক থেকে চলেছে রাশিয়ার দিকে, আমি সেই পথের ধারে গিয়েই মাঝে মাঝে বসতাম, তখন দেখতাম নানা রকমের বাসন কোসন রকমারী মালপত্র আর পেট্রোল গাড়ী বোঝাই হয়ে আসছে হিরাতে।

'হিরাত' হলো আফগানিস্থানের একটা নামকরা বাণিজ্য কেন্দ্র। ভারতবর্ষ থেকে অনেক আফগান ব্যবসা বাণিজ্য করে 'হিরাতে' ফিরে যায়। তারা গিয়ে সাধারণতঃ থাকে 'সরাই-এ-হিন্দ্' বলে একটা হোটেলে। কাজেই ওদেশের যারা 'হিন্দুস্থানে'র খবরাখবর পেতে চায় ওখানে ফিরেই তারা আড্ডা মারে। আমিও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতাম, কত কথা শুনতাম তার ইয়ত্তা নেই। আমার ধারণা ছিল আফগান যুবকরা সাধারণতঃ হয় উচ্ছৃঙ্খল, সেজন্যই এসব ছোকরাদের সঙ্গে কথাত বলতামই না, উপরন্তু যদি কেউ যেচে কথা বলতে আসতো, আমি সেদিকে কান না দিয়ে চুপ করে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করতাম।

যাক; এখন সেই ডাক্তার বাবুর কথাটাই একটু বলে নিই।

আমাদের ভারতীয় ডাক্তার বাবুটি জাতিতে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে মুসলমান, কিন্তু আমাকে বড় সুনজরে দেখেছিলেন। আর সেইজন্য আমাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণও করতেন। একদিন আমি আমার আস্তানায় অর্থাৎ সেই হিন্দুটির ঘরে বসে আছি এমন সময় সেই ডাক্তারের বাইশ আঙ্গুলে ছেলে (ছেলেটির প্রত্যেক হাতে ছ'টা ক'রে আঙ্গুল বলে অনেকেই তাকে 'বাইশ আঙুলে' বলে ডাকতো) এসে বল্লে, "কাকা, বাবা আপনাকে ডাক্‌ছেন, একটা ভারি মজার ঘটনা হয়েছে। ঘটনাটা হচ্ছে—একটি যুবক চুরি করেছিল সেজন্য তাঁর বাঁ হাতটি কাটা হয়ে গেছে, আর সে এখন হাসপাতালে আছে।" বটে! চুরির

অপরাধে হাতকাটা ! এ বড় তাজ্জব সাজা। তক্ষুনি সে দৃশ্য দেখবার জন্যে ডাক্তারের বাড়ী চল্লাম।

ডাক্তারের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে হাতকাটা ছেলেটির অবস্থা দেখে কিন্তু চোখে রুমাল দিয়ে ফিরে এলাম। ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ী ফিরে এসে এই যুবকের সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি কথা বললেন, তাই হল আসলে আমার এবারকার গল্প।

এই আফগান যুবকটির নাম হলো 'আলী গুল্' ; ডাক নাম হয়তো অন্য কিছু আছে। সেটা সঠিক জেনে উঠতে পারিনি। কাজেই 'গুল্' বলেই তার নামটা সোজা করে নেওয়া যাক্। 'গুল্' হিন্দুস্থানে থাকত, আর সেখানে সুদে টাকা খাটিয়ে যা দু'পয়সা রোজগার করত তাই নিয়ে তার বাবাকে দিত। বাবার কিন্তু তাতেও অভাব মিটতো না, বাপটা ছিল এমনি হতভাগা, অভাবের তাড়নায় নানারকম কুকার্য্য করে সে অনেকবার জেলও খেটেছে এবং তার চুরি করার অভ্যাসটাও রয়ে গেছে। 'গুল্' হিন্দুস্থান থেকে টাকাপয়সা নিয়ে দেশে ফিরে যাবার পরেও 'গুলে'র বাবা এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে একখানা ইরাণী রুমাল চুরি করে এবং পুলিশ 'গুলে'র বাবার কাছে সেই রুমাল দেখতে পেয়ে তাকে আটক করে। 'গুল্' পুলিশকে নানারকম মিথ্যার দোহাই দিয়ে এই কেলেঙ্কারীর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পেরে ওঠে নি।

'গুল্' ভেবে দেখলে যখন তার বাবার এই অপকীর্ত্তি চুরির

খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। সে অগাধ টাকার মালিক। 'হিন্দুস্থান' থেকে সে এনেছে এতটাকা, হয়েছে বড়লোক—সত্যিইতো এ ভয়ানক অপমানের কথা! 'হিন্দুস্থানের' এক এক টাকা তাদের দেশের চার চার টাকার সমান। হিন্দুস্থানের টাকাকে আফগানরা "কালদার" বলে থাকে। 'কালদার' শব্দটার মানে জাননাতো? খুব জমকালো মানে—অনেকটা আমরা যেমন বলি 'সাত রাজার ধন মাণিক'। তেমনি সাত রাজার সম্পত্তি এক করেই এক 'কালদার' হতো প্রাচীনকালে আফগানিস্থানে। প্রাচীনকালের আফগানীদের নাকি সেই ধারণা থেকেই এ 'কালদার' কথাটা এসেছে। এই রকম অসংখ্য 'কালদারের' মালিক 'গুল্'—আর তার বাবা কিনা চোর! এ অপমান থেকে বাঁচবার উপায় কি ঠাওরাতে না পেরে শেষকালে 'গুল্' কাজীর কাছে গিয়ে বল্লে সে নিজেই রুমাল চুরি করেছিল, তার বাবা, সে-ই রুমালটিকে তাঁর ছেলের রুমাল মনে করে নিয়ে গিয়েছিল। তার বাবার কোন অপরাধ নেই।

কাজী অমনি আদেশ দিলেন, যে হাতে সে চুরি করেছে, সে হাতখানা কেটে ফেলতে হবে কাজীর সাম্‌নেই। অমনি কাজীর কথামতো 'গুল্' তার বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিলে—বাঁ হাত কাটা হলো।

তার বাবা যদি টের পেত যে এ অপরাধে তার ছেলের হাত কাটা যাবে, হয়ত সে নিজে স্বীকার করত তার অপরাধ, কিন্তু

সে ঘটনাটা ঘটবার আগে একথা সে টেরই পেলে না। যখন টের পেলে ছুটতে ছুটতে কাজীর দরবারে হাজির হয়ে দেখে—ছেলের বাঁ হাত কাটা, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ছে।

'গুল্' দেখলে তার বাবা—এসেছে—সে ঐ যন্ত্রণায় মধ্যে তার কাটা হাতখানাকে ডানহাতে তার বাবার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্ল—"এই নাও তোমার পাপের ফল।" 'গুলে'র বাবার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, সে সেই মুহূর্ত্তে পাগলের মত তার ছেলের কাটা হাতখানাকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল—কেউ তার খবর রাখলে না। 'গুল্'কে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো তারপর! ডাক্তারের মুখে এই গল্প শুন্তে শুন্তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল সেদিন—জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'এ কি সত্যি!

সত্যি! পাঠানরা অমনি শক্তিশালী জাতি! সেই গল্প মনে পড়লে আজও ভাবি যে, সামান্য একটা রুমাল চুরি করার অপবাদ থেকে মর্য্যাদা রক্ষা করতে যদি এদেশের যুবকরা এক-একখানা হাত কেটে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে—তা'হলে পরাধীন হয়ে থাকার অপবাদ থেকে জাতের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিতে পারবে না কেন?

স্বাধীন তুর্কী

তুর্কীতে আমি অনেকদিন ছিলাম, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু তোমাদের হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, বর্ত্তমানের তুর্কী আর প্রাচীন তুর্কীতে কতটা তফাৎ। সেকালের সেই তুর্কীতে লোকে যে সব ঘরে বাস করতো, তাতে জানালা বড় একটা থাকতো না—আলোর 'প্রবেশ নিষেধ' ছিল তাদের ঘরে। অপরিষ্কার কাপড় পরতো, স্নানের বালাই ছিল না বললেই চলে—কালেভদ্রে কখনও 'হামামে' গিয়ে একবার কোনও রকমে স্নান করতো। লেখাপড়া শিখতো না, ধর্ম্মের গোঁড়ামি যথেষ্ট ছিল। সে দেশের মেয়েগুলোকে পর্দ্দানসীন করে ঘরের কোণে ঠেসে রাখা হতো। এ সব কুসংস্কার ছাড়াও আরও যে কত কুসংস্কার ছিল, তার আর হিসেব-নিকেশ নেই! কিন্তু তারপর!

তারপর মুস্তাফা কামাল পরাধীন তুর্কী জাতির মধ্যে জাগরণের সাড়া আনলেন। তিনি যখন হাতে শক্তি পেলেন, তুর্কী যখন স্বাধীন হলো, তখন তিনি প্রথমেই গোটা দেশটাতে সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির নিয়ম-কানুন বদলে দেবার জন্য মনকে শক্ত করলেন। পরিবর্ত্তনের প্রবল বন্যা বহিয়ে দিলেন। এতে যারা প্রতিবাদ করলে, তাদের কোন কথায় কান না দিয়ে জেলে পাঠালেন সকলকে—অনেককে আবার

কবরে পাঠিয়ে দিলেন যমের দুয়ারে। এইভাবে দলাদলি আর কুসংস্কারের পক্ষপাতী সমস্ত লোকগুলোকে মেরে বা সরিয়ে নিষ্কণ্টক করলেন তাঁর এগিয়ে চলার পথকে।

তারপর দেশটাকে এমনই চট্‌পট্‌ বদলে ফেললেন, যা দেখে গোটা ইউরোপের লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরিবর্ত্তন সব লোকেই চায়, কিন্তু পৃথিবীতে কতকগুলো লোক এমনই পাপক্ষণে জন্মেছে যে, তারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় নানারকম বুলি আউড়ে। কিন্তু শেষটায় পেরে ওঠে না। হার মানতেই হয় নতুন যুগের নতুন সমাজ স্রষ্টাদের কাছে। এদেশেরও অনেক কুসংস্কার ও সামাজিক গোঁড়ামি দলাদলি এখনও দেখছি রয়েছে পুরো-মাত্রায়—সে সব ঘোচাবে তোমরাই —যারা আজ নতুন আদর্শে গড়ে উঠছো। যাক্ সে কথা। যেদিন কামাল চিরাচরিত প্রথা উল্টে আদেশ দিলেন— শুক্রবারে কাজ করতে হবে এবং রবিবারে কাজ করতে হবে না, সেদিন আমি ইস্তাম্বুলেই ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, সেদিন সেখানে হবে একটা বিদ্রোহ। আমার বন্ধু সাইপ্রাসবাসী মিঃ আমেদও বলেছিলেন, এবার হয়তো কামালের প্রাণ যাবে। যুদ্ধ-বিপ্লবে মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাঁচা শক্ত! কিন্তু আশ্চর্য্য! শুক্রবারের কাজ চল্‌লো অন্যান্যদিনের মতই, কেউ প্রতিবাদ করলে না। আবার শনিবারের দুপুরে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। কামালের আদেশ অমান্য করে কেউ দোকান খুলে রাখতে সাহসও করলে

না। ভাবছো, জুলুমের ভয়ে? তা নয় কিন্তু! পরের রবিবারে আমি গোটা ইস্তাম্বুল সহরটি মিঃ নিকলসনের সঙ্গে বেড়িয়ে এসেছিলাম। একটি দোকানও খোলা দেখতে পাইনি, এমন কি একটা সিগারেটের দোকানও নয়। দোকানপাট যা খোলা ছিল, তা শুধু 'ডাক্তারখানা' এবং খাবারের দোকান। বুড়োরা দেখলাম এ ব্যাপারে গোপনে গোপনে ঘোঁট পাকাচ্ছে—মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু কামালের আদর্শে তুর্কীর ছেলেমেয়েরা একদম বদলে গেছে—তারা নতুনের বড়ই পক্ষপাতী। এমন কি, আমি শুনলাম, ঘরে যদি তাদের বাপ-মা সেই প্রাচীন তুর্কীর কথা, সুলতানের কথা চুপি চুপি বলেন, তবে এসব খবর তারাই পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে বলে দেয়। তারা পরাধীনতার বিলাসলোভী বাপ-মাকেও সমর্থন করে না। তারা স্বাধীনতা চায় এবং তা তারা পেয়েছে কামালের দৌলতে। আগে তুর্কীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে কাঠমোল্লারা মাদ্রাসায় বসে থাকতো বেত হাতে করে। চড়, কিল এসব তো ফাউ ছিল। যাক, কামালের চেষ্টায় সেখানে শিশুসদন গড়ে উঠ্লো, কেউ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর সামান্য অপরাধে মারপিট, জোরজুলুম করতে পারে না। তবে খুব যারা বেয়াড়া বজ্জাৎ ছেলেমেয়ে, তাদের জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থাও হলো। তাই কামালের নেতৃত্বে নতুন জাতি অল্পদিনে অতি সহজেই গড়ে উঠ্লো।

বর্ত্তমান তুরস্কের নতুন ধরণের ঘরবাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ,

লিখবার রোমান অক্ষর সকলেই পছন্দ করে। আগে তুর্কীতে এদেশের মত অনেক লোক নিরক্ষর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে একটি লোকও নিরক্ষর নেই বলা চলে। সেখানে ভিখারী আর বেকার কেউ নেই বললেই চলে, সবাইকে কাজ দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান তুর্কীর পথঘাট, বাড়ীঘর, সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। হামাম ঘর আর নেই, এখন হয়েছে সুন্দর সুন্দর স্নানাগার। সেখানে প্রত্যেকেই এখন বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে স্নান করে। মাদ্রাসা আর নেই, হয়েছে স্কুল, মোল্লার বদলে ছোটদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীদের হাতে।

আগে তুর্কীতে অনেক ছেলেমেয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাত, লোকে আল্লার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের দিয়ে ভিক্ষা করাতো, এখন আর তা হয় না।

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনও তুর্কীতে যাও তবে দেখবে তুরস্ক একটা প্রাণবন্ত নতুন দেশ হয়েছে। সেখানে আর কারো টাকাকড়ির অভাব নেই, কারণ তুর্কীতে বড়োদের জন্যে পেন্সনের ব্যবস্থা, মা ও শিশুদের জন্য শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গলের চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। সক্ষমদের জন্য কাজের ব্যবস্থা হয়েছে! তুর্কী নিশ্চয়ই সুখের দেশ। আমি যখন তুর্কীর গ্রামে গ্রামে বেড়াতাম তখন ভাবতাম আমাদের দেশও অমনি স্বাধীন হবে এবং আমরাও আমাদের দেশকে, আমাদের জাতকে নূতন করে গড়ে তুলব, আতা তুরকের মত একজন তেজোদীপ্ত সাহসী ও

সমাজবিপ্লবী নায়কের সাহায্যে। কিন্তু দেশে ফেরার পর নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম কারণ এদেশের যুবক যুবতীরা দেশের স্বাধীনতার নাম নিয়ে শুধু দল পাকিয়ে হুজুক করে—প্রত্যেকেই এক একটা আলাদা আলাদা মতবাদের দোহাই দিয়ে নেতা হয়ে বসতে চায়, অথচ জাতীয়তা-বোধ, কারুর মধ্যে এতটুকু নেই, দেশের মানুষের মর্ম্মবেদনা বুঝে কেউ এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নয়। সমাজের গলদ গুলোকে দিনের পর দিন চোখের সামনে ঘটতে দেখেও তার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে না। তাছাড়া এদেশের ছেলেমেয়েদের প্রতি নেতা, অভিভাবক শিক্ষকদের কোনও দৃষ্টি নেই। এখন কিন্তু একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। সে আশা তোমরাই। তোমরা কিশোর বয়সেই যে 'মণিমেলা' গড়ে ছোটবেলা থেকেই দেশসেবা করতে শিখছো এটা মস্ত কথা।

কলির দধীচি

তোমরা অনেক বড় বড় কর্ম্মবীরের নাম শুনেছ। কিন্তু এমনও অনেক বীর ছিল, যারা তাদের কোন স্মৃতিই রেখে যায় নি,—বইয়ের পাতায়। এই ধরণের এক কর্ম্মবীর একান্ত গোপনে সকলের অজানা থেকে নীরবে আত্মদান করে গেছে। তার কথাই তোমাদের বলছি—এই কর্ম্মবীরটির নাম গৌরীশচন্দ্র সিংহ রায়, বাড়ী তার নোয়াখালী জেলা। এই লোকটি আমার সঙ্গে অনেক দিন ছিল। কিন্তু চলার পথে, দুজনে দুটো আলাদা আলাদা দিক বেছে নিই, সে গেছলো একদিকে, আর আমি গেছলাম আর একদিকে।

১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে যখন সুদূর প্রাচ্য বেড়িয়ে শেষ করে সিঙ্গাপুরে ফিরে এলাম, তার সঙ্গে আবার দেখা হল। সে তখন আমাকে বলেছিল যে, সেও শিগ্‌গির পৃথিবী পর্য্যটনে বেরুবে। তার সেই কথা শুনে আমি হেসেছিলুম। এমন দুর্ব্বল শরীর নিয়ে সে যাবে কোথায়? তারপর আমি যেদিন সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিই, সে সেদিন আবার আমায় বলেছিল যে,—পৃথিবীটা সে আমার আগেই ঘুরে দেখে আসবে। সেদিন তার কথায় কিন্তু আগের মতই হাসতে পারিনি, বরং তার মনের আশাই মিটুক এই কামনাই করেছিলুম।

সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরতে ঘুরতে আড়াই বছর পরে যখন আমি লণ্ডনে পৌঁছলাম, তখন আমার হাতে মোটেই টাকাকড়ি ছিল

না। মাত্র দেড় ছটাক ভাতই ছিল আমার প্রতিদিনের খাবার। আর নগদ খরচ বলতে চার আনা পয়সা (চার পেনী), কারণ সেটা দিতে হতো বিছানা ভাড়ার বাবদ! এই রকম করে দিন কতক কাটাবার পর আমার মনে হলো ভূপর্য্যটক হিসাবে বক্তৃতা দিয়ে কিছু পয়সা কামিয়ে নিই, পরক্ষণেই মনে হলো কিন্তু লণ্ডনের মত সহরে কে কার খবর নেয়। আমি বড়লোকও নই যে, আমার বক্তৃতা শোনবার জন্য লোক জুটবে। তা ছাড়া আমার আগে—যে সব ভারতীয় ভূপর্য্যটক ওদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা নাকি কি সব কাণ্ড করে এসেছেন, যার জন্যে সেখানকার লোক ভারতীয় ভূপর্য্যটকের নাম শুনলে খাপ্পা হয়ে ওঠে।

শুনেছি সাপের, ভূতের আর ডাকাতের গল্প নিয়েই ছিল তাদের এ সব পর্য্যটক কাহিনী। কিন্তু সে সব কথা তো আর চিরকাল লোকের ভাল লাগে না। রোমাঞ্চটা সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ নয়, তবে তাতো কোনো কাজে লাগে না। কাজেই বাজে রোমাঞ্চের বই পড়ে যদি বানিয়ে বানিয়ে ভ্রমণ-কথা বলা যায়, তা হলে যাদের সামান্য বুদ্ধিও আছে তাদের কাছে ধরা পড়তে হয়—মিথ্যা কথাকে যে সত্যি বলে চালানো হচ্ছে তা সবাই বুঝতে পারে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় পর্য্যটকরা নাকি ঐ রকম কিছু করেছিলেন বলেই আমার দিকেও বড় কেউ চাইল না। শেষটায় যখন আমি নিরুপায় হলাম তখন চেনাশুনা কেউ লণ্ডনে আছে কিনা তার খোঁজ করতে লাগলাম।

একজন লোকও পেয়েও গেলাম। তিনি আমাকে গৌরীশের

কথা বললেন। সে নাকি হাসপাতালে রয়েছে, তার ভারি অসুখ। গৌরীশের খবর পেয়ে আমার হাসপাতালে যাবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু সেই হাসপাতালের নিয়ম হলো, বৃহস্পতিবার এবং রবিবার ছাড়া রোগীর সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না। রোগীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ডাকে অনুমতি পত্র আনাতে হয়, দস্তুরমত আবেদন নিবেদন করে। কাজেই তখনই একটা দরখাস্ত করে দিলাম, তারপর বৃহস্পতিবারে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

লণ্ডনের হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আর রোগীর প্রতি নার্সদের সেবা এসব দেখলে মনে হয় যে মরতে হলে এখানেই মরা উচিত। ঘরে ঢুকে দেখি গৌরীশ একটা বিছানায় শুয়ে আছে, বিছানার নীচে পালকের গদি। গদির উপর রবারের তোষক। তোষকের ভেতরে রয়েছে গরম জল। রোগে ভুগে তার শরীরের মাংস শুকিয়ে গেছে, শক্ত বিছানাতে শুতে নাকি তার কষ্ট হয়, তাই ঐ ব্যবস্থা। খাবারেরও সেই রকম ব্যবস্থা। কতবার কত রকমের খাবার আসছে, সেই সব খাবার তো দূরে থাক গন্ধও বোধ হয় আমাদের দেশের কোন হাসপাতালের কোন রোগী এ পর্য্যন্ত পায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসছে আঙ্গুর আর কমলালেবু, ভারতবর্ষ থেকে যাচ্ছে কাগজী লেবু, আরব থেকে যাচ্ছে খেজুর, হল্যাণ্ড পাঠাচ্ছে মাখন ও দুধ, কালিফোর্নিয়া যোগাচ্ছে হাসপাতালের রোগীদের ভাতের চাল। ভাবতো দেখি, এদেশের হাসপাতালের দুরবস্থার

কথা ! এদেশেওতো গবর্ণমেণ্ট আছে, শিক্ষিত ধনী লোক আছে, তারা কেউ কি ভাবে এসব কথা ?

গৌরীশের মাথার কাছে একটা রেডিও। যখনই তার রেডিও শুনতে সাধ যায় যখনই সে সুইচ টিপে দিয়ে শোনে দেশবিদেশের সংবাদগুলো। গৌরীশের দুটো আজব খেয়াল একবার হয়েছিল। প্রথমটা রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলা, দ্বিতীয়টা হলো এরোপ্লেনে চড়া। সে এরোপ্লেনে চড়েছিল এবং রাজা পঞ্চম জর্জ্জের সঙ্গেও দেখা করে কথাও বলেছিল। দেখলাম সেই গৌরীশচন্দ্র সিংহ রায় সেদিন শুয়ে আছে মরণের অপেক্ষায়। তার যক্ষ্মা হয়েছে।

আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অনেক্ষণ পরে আমাকে চিনলো, তারপর ধীরে ধীরে বললে কয়েকটি কথা। নাক দিয়ে সে শ্বাস ফেলতে পারে না। মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলতে হয় বলেই বোধ হয় খুব আস্তে আস্তে কথা বললে, নইলে সে বোধ হয় চীৎকার করে উঠত। আমাকে দেখে তার ভয়ানক আনন্দ হয়েছিল, তা তার চোখের ভাষায় বুঝতে পারলাম। যার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল পৃথিবী ভ্রমণ সে করবেই, সেই লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে, এতে তারতো আনন্দ হবার কথাই।

সে বল্লে "বিশ্বাস মশায় এরই মধ্যে বয়ের চাকরী করেই পৃথিবী বেড়িয়ে এসেছি দু'দুবার, তারপর লণ্ডনে এসে অসুখ করার দরুণ হাসপাতালে এসেছি। বাঁচা আর হবে না, বলুন তো

মরার পর আমার মৃতদেহটার কি ব্যবস্থা করা যায়?" আমি বল্‌লাম "হিন্দুমতে পোড়াতে হবে"? গৌরীশ বললে "তা হবে না, ডাক্তারেরা আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারবেন না ওঁরা, আমি তাঁদের সেবার বদলে কিছুই দিইনি, আমাকে কিছু তো দিতে হবে? আমি বললাম দেবার মত কি আছে গৌরীশ? আমরা গরীব।" গৌরীশ বললে—হ্যাঁ আছে বই কি, এই শরীরটা। আমি মরার পর এই শরীর নিয়ে ডাক্তাররা গবেষণা করুক, কি করে লোকের যক্ষ্মা হয়, তাতে অনেক শিখতে পারবে। ঐ দেখুন আমার চার্টে লিখে রেখেছি, "আমার মৃত্যুর পর আমার শরীরটা ডাক্তারদের দিয়ে দিলাম, তারা এটাকে নিয়ে যদি কোন কাজে লাগাতে পারে তবে তারা তাই যেন করে।"

গৌরীশের দেহ দানের কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে আর কোনও কথাই বেরুল না। শুধু ভাবলাম এমনি করেই দান করতে হয়। আমি গৌরীশকে বললাম, "ভাই তুমি আত্মত্যাগী বীর। ওসব কথা ভেবো না। মরবার পর যা হয় হবে।" মুখ দিয়ে আর কোনও কথাই বেরুল না আমার—মনে পড়লো 'দধীচির অস্থিদানের গল্প'। আজও মনে পড়ছে সেই কথা, সেই আত্মত্যাগী কলির দধীচির কথা; তাই তোমাদের শোনালাম, পারলে মনে রেখো গৌরীশের নাম,—সে এদেশেরই ছেলে, এদেশেরই গৌরব।

নির্লোভীর দান আজও অম্লান

সেদিন আকাশটা বেশ পরিষ্কার, আমি চলেছি হাঁটতে হাঁটতে, উদ্দেশ্য কাইজ বলে জায়গাটিতে যাওয়া। পথের দুধারে মাইলের হিসেব দেওয়া পাথর আর সাইন বোর্ড মেলাই। কিন্তু তা আমি পড়তে পারি নি, কারণ এগুলো সবই লেখা হয়েছে জাপানী অক্ষরে। চীন কোরিয়া এবং জাপানের পথে চলবার সময়েও ঠিক ঐ বিপদ হয়েছিল ; কারণ সাইন বোর্ড ও মাইল-পাথরের ভাষা না—বোঝার ফলে সেগুলো আমার কোন কাজেই আসে নি। যাকে পথে পেয়েছি তার কাছ থেকেই পথের সন্ধান জেনে নিয়েছি। কিন্তু 'কাইজ' যাবার পথে 'কাইজ'কে কেজ উচ্চারণ করার জন্য লোকে আমাকে উল্টো পথ দেখিয়ে দিয়েছে, আর আমি সেই উল্টো পথেই খুব উৎসাহের সঙ্গে চলেছি একবারও ভাবতে পারি নি যে, আমি পথ হারিয়েছি।

বেলা যখন দুপুর, তখন একটা সাইকেলের দোকান পড়লো পথে। ইচ্ছা হলো দোকানে বসে একটু বিশ্রাম করি। সবে তখন একটা নদী পার হয়ে এসেছি বলে বুট জুতা জোড়া আমার কাঁধেই ছিল, মোজা রেখেছিলাম বেল্টে বেঁধে, পা দুটো ছিল খালি। এমন অবস্থায় একটা দোকানে ঢুকে পড়াতে দোকানী আর তার লোকজন একেবারে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তারা জানত আমি কে। কারণ জাপান, চীন আর কোরিয়ায় পর্য্যটকের সম্মান আছে, দেশের লোকেরা তাদের দেশে কেউ পর্য্যটক

এলে তার খবরাখবর রাখে, তাছাড়া প্রত্যেক দিনই ওখানকার খবরের কাগজে আমি কোথায় যাচ্ছি—আসছি, সে খবরও ছাপা হতো। সেদিনকার কাগজে ছিল আমি 'কাইজ' যাচ্ছি। দোকানীর অবাক হবার কারণও তাই ছিল যথেষ্ট, আমি যে পথ হারিয়েছি তা তারা আমাকে দেখেই ঠাওর করতে পেরেছে।

দোকানীর ছোট ছেলেটির বয়স হবে সতের। সেই সেদিন খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা পড়ে অন্য সবাইকে বুঝিয়ে দিলে অনুবাদ করে ইংরাজীতে। কোরিয়ার সর্ব্বত্র আমেরিকার মিশনারীদের দৌলতে মেলাই আমেরিকান স্কুল খোলা হয়েছে। কোরিয়াতে কেউ খাঁটি ইংরেজী জানে না সবাই আমেরিকান ইংলিশ জানে। আমেরিকান ইংলিশ আর খাঁটি ইংরাজীতে প্রভেদ খুবই সামান্য। কিন্তু প্রচার কার্য্যের দৌলতে আজ কোরিয়ার অনেকেই বলে I speak American" I dont know English" কাজেই দেখেছি, প্রচারকার্য্যের জোরে কি না হয়? সে যাই হোক, আমার কাজ আদায় হয়েছিল আমেরিকার মিশনারী স্কুলের অনুগ্রহেই, সে কথাটা স্বীকার করছি।

দোকানীর ছেলে আমাকে বুঝিয়ে দিলে এদেশের শব্দের উচ্চারণ যদি ঠিক ঠিক ভাবে না করি, তবেই পথ ভুল হবার সমূহ সম্ভাবনা। ছেলেটি তার বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে 'কাইজ' চল্ল। আমি যে পথে এসেছিলাম ফিরে চল্লাম সেই পথে। যে বাড়ীতে আগের দিন রাত্রে থেকেছিলাম

সেদিন সন্ধ্যায় এলাম আবার সেই বাড়ীতে। সে বাড়ীর লোকেরা তো অবাক। ছেলেটি বুঝিয়ে দিলে—পথভুলই হলো ফিরে আসার কারণ।

তোমরা বোধ হয় জান না, কোরিয়ায় একটি নিয়ম আছে। সেটি হলো যুবক বা যুবতী মেয়ে অন্যত্র যদি গিয়ে রাত কাটায় তাহলে আগেই পুলিশকে সে খবরটা জানাতে হয়। এটা হলো আইন। কিন্তু এই আইন অমান্য করাই হলো কোরিয়ান যুবক-যুবতীর যেন একটা নেশা। কিন্তু আমি সঙ্গে থাকার দরুণ এই ছেলেটির হঠাৎ আইন অমান্য করার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠলো না, তাই আমাকে নিয়েই সে পুলিশ ষ্টেশনে গেল। পুলিশও আমার ফিরে আসার ইতিহাস শুনে একচোট হাসলে খুব। কিন্তু যুবকটির হাবভাব দেখে মনে হলো, সে যেন পুলিশের দেওয়া বাহাদুরীকে গ্রাহ্যও করলে না। তখনই মনে হলো, তবে কি সে তার দেশের আইনের বন্ধন কত শক্ত সেই কথাটা একজন বিদেশীকে বোঝাবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছিল আমাকে! তাই হয়তো হবে!

পরের দিন আমরা চল্লাম 'কাইজ'। আমদের হিসেব মাফিক 'কাইজ' পঁচিশ মাইল, কিন্তু পথটা খারাপ থাকায় অর্থাৎ বেশী উৎরাই এবং চড়াই থাকায় আমাদের পঁচিশ মাইল পথ চলতেই লেগেছিল ছ'ঘণ্টার মতন সময়। পথে কাদা মাটি ঘেঁটে অনেক খানা খোঁদল পার হয়ে আমাদের হাঁটতে হয়েছিল। কাজেই কাদা ছিটকিয়ে শরীরের সর্ব্বাঙ্গই বেশ চিত্র বিচিত্র হয়ে

উঠেছিল। 'কাইজ' পৌঁছবার আগেই আমরা একটি ছোট নদী পেলাম। সেই নদীটিতে নেমে যুবকটি তখনই নিজের মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে সাইকেলটাকেও পরিষ্কার করে নিলে। আমি কোন দিনই কিন্তু ঐ রকমটি করতাম না, ভাবতাম যত অপরিষ্কার পরিশ্রান্ত আর ক্লান্ত ভাব দেখাব, লোক সমাজে ততই সহানুভূতি পাব। কিন্তু এই যুবকটির কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিখলাম তাছাড়া সহরে অথবা গ্রামে পৌঁছবার আগে যে একটু বিশ্রাম করে শরীরটাকে সুস্থ করে নিয়ে যাওয়া উচিত তাও শিখলাম। সহরে পৌঁছতেই সেখানকার লোক সমাজ সেদিনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভবঘুরেকে দেখে আগের মতই সহানুভূতি দেখিয়েছিল এবং আমার ভণ্ডামির ভুলটা ভেঙে দিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে যুবকটি রইল আমার সঙ্গে তার সঙ্গে অনেক কথা হলো, সে বললে তার দেশের যুবক যুবতী বিদেশী কৃপার মামুলী লোভ সামলাতে না পেরে দেশের ও দশের অনেক সর্ব্বনাশ করে ফেলে। শুধু কি তাই! দেশের ছেলেমেয়েরা এমন অধঃপতিত হয়েছে যে তাদের না আছে শরীরের শক্তি, না আছে মনের জোর। বিদেশী সভ্যতার দেওয়া বিলাস আর লোভের মোহে তারা সব হারিয়েছে। অনেক কথা হবার পর ছেলেটি সেদিন একটি উপদেশ আমাকে শুনিয়েছিল। সেই উপদেশটার মর্ম্ম হলো লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। মামুলী লোভ যে দমন করতে পারে না, বাহাদুরী পাবার মত কাজ না করেও যে বাহাদুরীর লোভ সামলাতে পারে না তারই ভবিষ্যৎ জীবন

হয়ে আসে অন্ধকার। সে বয়সে ছোট হলেও কথাগুলো যে খুবই দামী বলেছিল তাতে আর ভুল আছে কি? তার লোভকে যে সে কিভাবে দমন করেছিল তারও প্রমাণ পেলাম পরের দিন।

পরের দিন সে যখন বিদায় চাইলে যুবকটির হাতে আমি একটি ইয়েন (মুদ্রা) দিতে চাইলাম সে তা নিলে না। আমাকে ইয়েনটি ফিরিয়ে দিয়ে চাইলে আমার পায়ের মোজা বাঁধা ছেঁড়া একটি গার্টার। আমি অবাক হয়ে পা থেকে খুলে নিয়ে দিলাম আমার ছেঁড়া একটি গার্টার। কিন্তু আরও অবাক হলাম যখন সে তার বদলে খুলে দিলে তার পায়ের নতুন গার্টারটি। নতুন গার্টার যতদিন টিকবে ততদিন অন্ততঃ তাকে আমি ভুলব না এই আনন্দেই সে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল; কিন্তু সে জানেনা তার সহানুভূতি আর সেবা, তার নির্লোভ দানের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে আছে সে আমার কাছে; সে গার্টার সেদিনই পা থেকে নেমে আমার সঞ্চিত স্মৃতির ঝুলির শোভা বাড়িয়েছে। আজও তার স্মৃতি রয়েছে চিরনূতন হয়ে আমার কাছে। তা কোনও দিনই পুরানো হবেনা।

সৎশিক্ষা লবে—তবেই বড় হবে

জার্মাণীর পথে চলেছি—সেদিন ছিল ভয়ানক দুর্য্যোগ। বৃষ্টি পড়ছিল, মাঝে মাঝে উল্টো বাতাসে আমাকে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, তুষারপাতও হচ্ছিল থেকে থেকে। সেই তুষারে চোখের চশমা ঢাকা পড়ে গিয়ে ঘোলাটে করে দিচ্ছিল আমার দৃষ্টি ; পথে কি আছে না-আছে তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। দেখতে যখন পাচ্ছিলাম, দেখছিলাম রাস্তার লোকরা হাঁ করে আমার দিকে দেখছে—কেউ কেউ পিছু নিয়েছে এবং যারা পিছু নিয়েছে, তারা সকলেই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে।

তুর্কী থেকে সুরু করে সারা ইউরোপের যেখানেই গেছি সেখানেই লোক আমাকে দেখবার জন্য ছুটে আসত, এ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি। আমাকে দেখবার জন্য কেন যে ওরা আসত, তা বোধ হয় তোমরা জান না। আমার আকৃতি, আমার চালচলন অন্যান্য ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মত ছিল না ; বরং বলা চলে সবই যেন অদ্ভূত সৃষ্টিছাড়া, দৃষ্টি-কাড়া। আমার মামুলী পোষাক, বিশেষ করে শোলার টুপিটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ছেলে বুড়ো সবাই ভাবত, নিশ্চয়ই কোন আজগুবী লোক হবে এই মানুষটা। কাছে এসে যখন দেখতো আমি একজন ভারতীয় পর্য্যটক মাত্র, তখন আবার আমার সঙ্গে কথা বলার ও ভাব করার প্রবৃত্তি জাগত। ওরা কথা বলত তাদের

যার যার নিজের ভাষায়, আমি তার জবাব দিতাম কি করে জান ?—ইঙ্গিতে ইসারায় হাত-পা মুখ নেড়ে। এতেই ওরা মজা পেত ভারি। এইভাবে ইঙ্গিতে কথা বলার জন্যই অনেকে আমার সঙ্গ নিতো।

দুর্য্যোগে সেদিনও যখন পথ চলছিলাম, তখন এই রকম অনেক জার্ম্মাণ বন্ধুই আমার সাথী ছিল। জার্ম্মাণরা আজ যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে নানা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লোকে তাদের দেখছে। কিন্তু তখনকার দিনে, অর্থাৎ ১৯৩৫, ৩৬ এবং ৩৭ সালে জার্ম্মাণ যুবক-যুবতীর কথা ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু সেখানকার ১৪।১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের কথা বলি, তা তোমাদের কাছে সত্যিই আশ্চর্য্য মনে হবে। আমার সঙ্গে যারা বাইসাইকেল চালিয়ে চল্‌ছিল সেদিন, তারা সবাই যাবে 'হেনোভার'। আমি ও যাব 'হেনোভার'।

জার্ম্মাণীর প্রায় প্রত্যেকটি বড় রাস্তার (হাই ওয়ে) দু'দিকেই ফলের সাজানো বাগান। তখন ছিল ফলের সময়। দু'দিকের ফলের গাছগুলো ফলে ভর্ত্তি। মাঝে মাঝে আমি ফল খেতাম, তবে গাছ থেকে পেড়ে নয়, গাছের নীচে যেসব ফল পড়ে থাকতো, তাই খেতাম।

সেদিন চলার সময় হঠাৎ একটা প্রবল ঝড় বইতে সুরু হলো। তিন চারটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে আমাকে মাঝে রেখে কুণ্ডলী করে ঘিরে বসে পড়ল। ও-দেশের ছেলেমেয়েরা জাতের ধার ধারে না, তারা চায় বয়স্কদের কাছ থেকেও একটু সমবেদনা,

দরদ ভালবাসা। অল্পক্ষণেই আমি তাদের দরদী বন্ধু হয়েও পড়েছিলাম। তাই ওরা আমাকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অমনি করে ঘিরে বসল।

ঝড় শেষ হয়ে গেলে যখন আমরা ফের পথে চল্‌তে লাগলাম, তখন এক যায়গায় পথের উপর অনেক আপেল জড়ো করা রয়েছে দেখে আমি দাঁড়ালাম, এবং একটা আপেল তুলে নিয়ে কামড় দিলাম, কিন্তু আপেলটা ছিল ভয়ানক টক। আমি টক আপেলটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য আর একটা আপেল মুখে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে একটি ছেলে এসে ইঙ্গিতে বললে অমন করে আপেলটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া নাকি আমার অন্যায় হয়েছে, পথের উপরই রেখে দেওয়া উচিত ছিল। কি করে আধ-খাওয়া আপেলটাকে পথে রেখে দিতে হয় ছেলেটি আমাকে তাই দেখালে। সেই আপেল কুড়িয়ে তা মুখে দিলে, খানিকটা তার খেলে, বাকিটুকু রেখে দেবার আগে আগে যেখানটাতে দাঁতের দাগ পড়েছে, ততটুকু পর্য্যন্ত ছুরি দিয়ে বেশ ভাল করে কেটে ফেলে দিলে, তারপর তিনটা আপেল একত্র করে তারই উপর সেই আধ-খাওয়া আপেলটা রেখে দিলে। ও-দেশের ছেলেদের এ রকমভাবে অপব্যয় না করার অভ্যাস দেখে বাস্তবিকই সেদিন আমার এ বিষয়ে বেশ শিক্ষা হয়েছিল। অযথা অপব্যয় করার স্বভাবটা ভারী খারাপ, এতে জাতির দৈন্য বাড়ে।

তোমরা বোধ হয় জান না, একটা জাতের উন্নতি করতে

হলে তাদের কত কি শিখতে হয়। পৃথিবীর যতগুলি জাত আজকের দিনে পৃথিবীর বুকের ওপর দাগ কেটে যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকটি জাতের পেছনেই সৎশিক্ষার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিনই লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম, কোনও ছেলে অথবা মেয়ে যখনই কাশ্‌ছিলো এবং তারপর থুথু ফেল্‌ছিল, তখন সাইকেল থামিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পথের বাইরে থুথু ফেল্‌ছিল। এ রকম করার একমাত্র কারণ হলো, অনেক সময় সাইকেল থেকে থুথু ফেললে পেছনে যারা সাইকেল চালিয়ে আসে, তাদের ওপর থুথু গিয়ে পড়ে। তাদের এই সামান্য সাবধানতার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছিল অন্যের অনিষ্ট না করার কত বড় শুভ চিন্তা, তা কি বুঝছো ? এদেশে এসে বহু শিক্ষিত লোককেও দেখেছি তাঁরা বাসে ট্রামে যেখানে সেখানে থুথু ফেলছেন, বিড়ি সিগারেট টেনে লোকের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে দিচ্ছেন,—খেয়াল নেই যে, সেটা অপরের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর ও অস্বস্তিকর।

দেখ তোমরা এই সব ছোট-খাটো দোষত্রুটি শুধ্‌রে নিয়ে—বড় হও, জাতকে বড় করো।

মানুষের জন্য ত্যাগে হও ধন্য

ইউরোপের অনেক কথাই বলেছি আগে, আজ তোমাদের কাছে যে ঘটনাটি বলবো সেটি আমার কাছে বেশ অদ্ভূত ঘটনা বলেই মনে হয়। আমি এনতোয়ার্পে থাকতাম "স্যালভেসন্ আর্মি" (Salvation Armyর) বাড়ীতে, সেই বাড়ীতে যত রাজ্যের গরীব দুঃখীরা এসে বাস করত। আমিও গরীব, তাই গরীবদের সঙ্গেই থাকতাম।

একদিন বিকালবেলা স্যালভেসন আর্মির কর্ত্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন ঐ কর্ত্তাটির বিড়ালটিও আমাদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বিড়ালটা কি করছিল এবং কোথায় যে গেল তা আমি বা ঐ কর্ত্তা' কেউই লক্ষ্য করিনি, আমরা কথাতেই মত্ত ছিলাম।

খানিক্ষণ পরে হঠাৎ কয়েকটি ছেলে এসে কি যেন বলল ঐ ভদ্রলোককে—তারপর তিনি আমাকে পথে দাঁড় করিয়েই তার বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে তার সঙ্গে যেতে বললেন। খানিক দূর যাবার পর দেখলাম তার সেই পোষা বিড়ালটা একটা পচা ইঁদুর খাচ্ছে, উনি তাই না দেখে কথা নেই, বার্ত্তা নেই বিড়ালটাকে তখুনি গুলি করে মেরে ফেললেন এবং ছেলেদের কি যেন বললেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখি ছেলেরা ছোট

একটা ময়লা ফেলা গাড়ীতে বিড়ালটাকে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এলো দূরে ময়লা ফেলার ডাষ্টবিনে।

বেলজিয়ামে মিউনিসিপ্যালিটির ছাড়া, কিশোর দলের ছেলেদের অমনি ছোট ছোট গাড়ী আছে যার সাহায্যে তারা নিজেদের পাড়ার ময়লা অন্যত্র নিয়ে ফেলে আসতে পারে। নিমেষের মধ্যে এই যে ঘটনা ঘটলো তা আমাকে অবাক করে দিলে। ছেলেদের চলে যাওয়ার পর কর্ত্তাকে বললাম, আপনার পোষা অমন সুন্দর বিড়ালটাকে কেন মেরে ফেললেন? 'কর্ত্তা' আমাকে বললেন ঐ ছেলেরাই তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, তাঁর পোষা বিড়ালটা রোগ-সংক্রামিত পচা ইঁদুর খাচ্ছে,—তাদের আশঙ্কা এই যে, স্যালভেসন আর্মির বাড়ীতে যদি বিষাক্ত ইঁদুর খেকো বিড়ালটা যায়, তা'হলে অনেক লোকের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়বে। বিড়ালটাকে মেরে ফেলাই উচিত। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা।

ছেলেদের সুবুদ্ধি দেখে কর্ত্তার বিড়ালের প্রতি ভালবাসাটা লোপ পেয়েছিল, এবং বিড়ালটাকে নিজের হাতেই মারতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে একথা বুঝতে আর দেরী হলোনা। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হলে জাতির কল্যাণ করতে হলে নিজের প্রিয়বস্তুর মায়া অনেক সময় যে ছাড়তে হয় এই ছিল তার উপদেশ আমার প্রতি। সত্যি তাই ভাবি, মানুষের প্রতি মানুষের প্রতি মানুষের ভালাবাসা অমনি করে কবে আমাদের দেশেও দেখা যাবে। কাতারে কাতারে মানুষ মরছে দেখেও

আমরা নির্জ্জীব জড় হয়ে বসে থাকি এদের মৃত্যুর কারণ বা উপলক্ষ্য গুলিকে পৃথিবী থেকে ঘুচিয়ে দেওয়ার এতটুকু চেষ্টা করিনা আমরা কেউ। আমাদের দেশে আমরা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতির মত ভয়ানক সমস্ত রোগকে লুকিয়ে রেখে—আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সেই রোগের বীজাণু ছড়িয়ে জাতির যে কত ভয়ানক সর্ব্বনাশ করি—তার আর হিসেব নেই। বিদেশে এসব রোগ হলে, রোগী পরিবার ও সমাজ থেকে বহু দূরে সরে যায়, কারণ তারা যে জাতির কল্যাণকে নিজের কল্যাণের চেয়ে বড় মনে করে। আমাদের কারুর এ শুভ চিন্তা নেই, এতে কি করে দেশের কল্যাণ হবে? কথাটা একটু ভেবে দেখো।

শিক্ষা

★

সংস্কৃতি

★

সেবা শতাব্দী